মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১৬ – ৩১ মে ১৯৮৫

চোখের দেখা ঃ নারী- পুরুষের মৌলিক প্রভেদ

রবীন্দ্রানুরাগী সন্‌জীদা খাতুন

শিশিরকণা ধরচৌধুরী





হেমার দ্বিতীয় সন্তান



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : নিলয় হাজরা

স্ক্যান : অভিজিৎ ব্যানার্জী

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


খাটা খাটনি তো সবার লেগেই আছে! আমার স্বামীর অফিস, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, আর আমার হাট-বাজার করা। তাই আমরা নিয়ম করে অন্তত হরলিক্স টুকু রোজ সবাই খাই।
হরলিক্স আমাদের পরিবারের সকলেরই সাথী।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
piccadily Restaurant
KAMAL READYMADE
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8072BEN

আপনার সন্তানকে জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ করবার একমাত্র পন্হা

চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক

খন্ড ১, ২, ৩ এবং ৪

ছোটদের বৌদ্ধিক বিকাশ তখনই ভাল হতে পারে যখন পাঠ্য পুস্তক পড়া ছাড়া তার কিশোর মনের মধ্যে জাগা 'কেন?' এবং 'কি করে?' এই ধরনের শত সহস্র প্রশ্নের সমুচিত উত্তর তাকে ঠিক সময় উপলব্ধ করাতে পারা যায়। —



চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক

খন্ড ১, ২, ৩ এবং ৪



ডবল ক্রাউন সাইজ
প্রতিটিতে ২৩২ পৃষ্ঠা

Price
Rs 20/- each
Postage
Rs 4/-

'ছোটদের জন্য বিশেষভাবে খুঁজে খুঁজে একত্রিত করার নিমিত্ত এক দল বিশেষজ্ঞ এই কাজে নিযুক্ত আছেন।'

আনুমানিক প্রত্যেকটি খণ্ডে ২00টি প্রশ্ন আছে, তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্নের নমুনা ঃ

বল পেন কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল? ● চীনামাটি কি জিনিষ? ● আমাদের ক্ষুধা পায় কেন? ● পৃথিবীর সব থেকে কর্ম ব্যস্ত বিমান-বন্দর কোনটি? ● আগুন নেভানো হয় কেমন করে? ● নরমাংসভোজী মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে কি? ● খেলোয়াড় পেলেকে 'কালো হীরে' বলা হয় কেন? ● পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং কোনটি? ● তিমিমাছ মাছ নয় কেন? ● আমরা ১লা এপ্রিলকে 'ফুল্সডে' বা বোকার দিন বলি কেন? ● সমুদ্রের জল শুকিয়ে যায় না কেন? ● 'ডিজনী ল্যান্ড' কোথায়? ● তাজমহল কেন নির্মীত হয়েছিল? ● কস্তুরী-মৃগ কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ● বাঁশের পরিচয় কি গাছ না ঘাস? ● ব্রহ্মান্ড জন্মাল কোথা থেকে? ● পৃথিবীটা কত পুরানো? ● মানুষ বুড়ো হয় কেন? ● এলার্জি কি জিনিষ? ● ক্যালান্ডার তৈরি হল কী করে? ● রুশ বিপ্লব কী ছিল? ● মূল্যবান রত্ন কি কি? ● হাসপাতাল কখন থেকে চালু হয়েছিল? ● শরীরে শিরা ও ধমণীর কাজ কী? ● গভীর সমুদ্রে ডুবুরীরা কিভাবে কাজ করে? ● অন্ত:সলিলা নদী কাকে বলে? ● উড়ন্ত বিমানের উচ্চতা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? ● 'অতি বেগুণী' রশ্মি' কাকে বলে? ● 'পরমাণু ঘড়ি' কাকে বলে? ● 'ভারশূন্যতা' কাকে বলে? ● 'মাইক্রোফোন' কিভাবে কাজ করে? ● 'টেলিপ্রিন্টার' কিভাবে কাজ করে?



Postage FREE on any 2 Books

Also on Sale
English Edition of
Vol. I, II, III, IV & V
Price and
Pages same
Double crown size
Approximately **240** Pages each

AVAILABLE AT leading bookshops. A.H. Wheeler's and Higginbotham's Railway Book stalls throughout India or ask by V.P.P. from:

PUSTAK MAHAL Khari Baoli, Delhi- 110006

New Show Room: **10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110002**

TELEX: 031-61790 SBP IN

Vandana PM/Ban-6

সুকন্যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ২৩/১৬ – ৩১ মে ১৯৮৫/২ – ১৭ জৈষ্ঠ ১৩৯২

সম্পাদকীয়

মানবজাতির স্রষ্টা 'মনু' বলেছিলেন 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন। প্রাচীন সভ্যতার সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ভারতে আজ উপরোক্ত মন্তব্যকে অনুধাবন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জননী এবং জন্মভূমিকে একাসনে বসিয়ে নারীজাতিকে একটি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন। কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাবার প্রাক্কালে মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তির চরম অবমূল্যায়ন দেখে আমরা যথার্থই আতঙ্কিত হচ্ছি। জীবনবোধের সঙ্গে সাযুজ্যহীন, তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষালাভ করে মানুষ যত শিক্ষিত (?) হচ্ছে ততই তার অন্তরের কোমল প্রবৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দিচ্ছে। প্রতিদিন পত্রপত্রিকা খুললেই নির্মমভাবে বধূহত্যার করুণ কাহিনী দেখা যাবে। কোনো পরিবারের আদরিণী কন্যা অপর পরিবারে বধূ হয়ে গিয়ে নিত্য গঞ্জনা, অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, নয়ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন কিংবা তাকে পিটিয়ে, পুড়িয়ে, বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হচ্ছে। মানুষ সামাজিক জীব। কোনো মানুষই একাকী, নিঃসঙ্গভাবে বাঁচতে পারে না। মানবসমাজ নর ও নারীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে নারী তার কমনীয়তা, লাবণ্য, ধীশক্তি, সর্বোপরি অনুপ্রেরণা দিয়ে পুরুষকে বাস্তবের রুক্ষ, কঠোর জীবনের আবর্তে মোকাবিলা করতে সাহস, স্থৈর্য এবং মানসিক আনন্দের রসদ যুগিয়ে চলেছেন। নারী হচ্ছেন সমাজের শ্রী। তাকে উপেক্ষা করে কোনোভাবেই সুস্থ, সমৃদ্ধ, সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তবে হতাশার কালো মেঘের ফাঁকে একটি আশার আলোকরেখা দেখা যাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ঘোষণা করেছেন তাঁর মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র মহিলা কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি আলাদা মন্ত্রক গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত এই প্রথম। তিনি বলেছেন সমাজের বুকে নারীজাতি বরাবর একটি জাগ্রত বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। বিশ্ব তথা ভারতীয় সমাজকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে নারীর কল্যাণময়, কর্মতৎপর অবদান পুরুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়। একটি সমাজকে তখনই প্রগতিশীল সমাজ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে যখন সেই সমাজের রমণীরাও যথোপযুক্তভাবে বিকশিত হন এবং পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করেন। নারীরা সমাজের অর্ধাংশ, সুতরাং সমাজের অর্ধেক প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতা উপেক্ষিত হলে সেই সমাজ কখনই সম্পূর্ণরূপে গতিশীল, সজীব, স্পন্দিত এবং সার্থক হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নতুন ভারত গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নারীকে পুরুষের সম-অংশীদাররূপে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং তাদের উন্নয়নকল্পে তিনি নানা গঠনমূলক প্রস্তাব কার্যকর করতে পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বিবি মুখার্জি ।। ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজিঃ অফিস : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

মতামত

নার্সদের নিরাপত্তা

'সুকন্যা'র নতুন নতুন সংখ্যা যত পড়ছি ততই এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি। বর্তমান সংখ্যা পড়া শেষ হতে না হতেই আগামী সংখ্যার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। গত ১৬ – ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত কর্মরতা মেয়েদের (অবিবাহিতাদেরও) আবাসন সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি মনে বেশ দাগ কেটে গেল। সত্যি এটা আমাদের একটা সামাজিক সমস্যা। আমার তো মনে হয় এরকম আরো অনেক সমস্যা আছে, যা শুধু কর্মরতা অবিবাহিতা মেয়েদের নিজস্ব। তার মধ্যে বর্তমান যুগে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নার্সের পেশায়। নার্সদের নিরাপত্তার অভাব অন্যতম একটি সমস্যা। আমার তো তাই মনে হয়। আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি, কেননা এ সম্পর্কে অন্য রাজ্যের সমস্যা আমার অভিজ্ঞতায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া আমি পশ্চিমবঙ্গের একজন নার্স। এই পেশায় আমার কর্মজীবন দু বৎসরের। তাতে আমার যা অভিজ্ঞতা বা নার্সের পেশায় এসে যে অসুবিধাগুলো চোখে পড়েছে তারই দু-তিনটি লিখছি। সমস্যাগুলো হচ্ছে :

(১) কর্মরতা নার্স ওয়ার্ডে 'ডিউটি' করতে গিয়ে, বিশেষ করে 'নাইট ডিউটি'তে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন।

(২) বাড়ি থেকে অনেক দূরে কর্মস্থল হওয়ায় অল্পবয়সী নার্সকে যখন কাজ করতে হয় তখন না আছে ওয়ার্ডে নিরাপত্তা, না আছে হোস্টেলে নিরাপত্তা। আজকাল তো আবার অনেক হাসপাতালে নার্সদের হোস্টেলে জায়গা পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। যাও-বা জায়গা পাওয়া যায়, তাও অনেক ক্ষেত্রে নানা কারণে বাসের অযোগ্য।

(৩) সমাজসেবা করেও নার্সরা সমাজের চোখে অবহেলিত।

অথচ, কর্মরতা মহিলাদের অধিকাংশই নার্স। এবং এই পেশায় নারীরাই এক বিরাট অংশ। তাদের উন্নতি তো আমাদের সকলের একান্ত কাম্য।

আজকাল তো আবার নার্সিংয়ের একটা 'ক্যাটাগরি' বহুমুখী মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রামেগঞ্জে 'ডোর-টু-ডোর' কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় তারাও নানাদিক থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন।

তাই, নার্সের এই পেশায় নারীর ভূমিকা এবং তাদের সমস্যা নিয়ে যদি কোনো প্রতিবেদন বা লেখা আপনারা প্রকাশ করেন, তাহলে আমরা নার্সরা এবং সমাজের অন্যান্যরা উপকৃত হব।

জনৈকা নার্স
মুর্শিদাবাদ

সুস্থ সংসার ও মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

আমি আপনাদের 'সুকন্যা' পত্রিকার পাঠিকা। নিজে না কিনলেও, অন্য কোনো দিদি বা বউদির বাড়ি থেকে এনে পড়ে ফেলি। অবশ্য আমার সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা গান্ধীনিহত হওয়ার পরে প্রকাশিত সুকন্যার একটি সংখ্যা কিনে রেখে দিয়েছি। 'ইন্দিরা গান্ধীর সব মত ও পথকে আমি বিশ্বাস ও সমর্থন করি। কিন্তু তাঁর একটিমাত্র কথা আমি সমর্থন করতে পারিনি। 'সুকন্যা'র পর পর কয়েকটি সংখ্যায় দেখলাম যে, সেই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে। বিষয়টি হল, মেয়েদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়া, তারপর বিয়ে, প্রয়োজনে বিয়ে না হলেও ক্ষতি নেই, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হলেই হল। কিন্তু আমার মতে, এই জিনিসটি ভীষণ ভুলপথগামী এবং ভবিষ্যৎ বিপদের। আমি নিজে একজন মেয়ে গ্র্যাজুয়েট এবং ছেলেমেয়ে পড়াই, সেই ক্ষেত্রে সুনামও আছে। তবে আমার উপার্জন শুধুমাত্র বাবা-মার কাছে হাত না পাতার জন্যই। আজকালকার মেয়েরা অনেকেই বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা এবং লেখাপড়া শিখে তাঁদের মনের উন্নতি এটুকু মাত্রই হয়েছে যে, 'স্বামীকে তোয়াক্কা না করে শখ-শৌখিনতা এবং বিলাসিতা করবো – যার জন্যে রোজগার করা একান্ত দরকার। যদি স্বামী কিছু বলেন তবে যেন মুখের উপর বলতে পারি, আমার টাকায় আমি যা খুশি তাই করবো। তোমার কাছে তো চাই না?' কিন্তু এই কি উন্নতি? বিদেশের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। বিদেশে ছেলেদের সঙ্গে ফ্রি মেলামেশা, বিয়ে এবং ডিভোর্সের বাড়াবাড়ির জন্যই উপার্জন প্রয়োজন, যা আমাদের মত দেশে এখনও অচলপ্রায়। চাকুরি না করলেই অলস একথা ভুল। সজীব, উন্নতরুচি, শিক্ষিত সুন্দর মনের ও চরিত্রের সংসার গড়ে তোলাই মেয়েদের সবথেকে বড় কাজ। এ জন্যেই এখনকার চাকুরি করা মায়েদের বদলে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী নেতাজী, ইন্দিরাজীর মায়েদের নামই ইতিহাস মনে রাখবে। তাছাড়া এই বেকারির দেশে খুবই ভীষণভাবে প্রয়োজন না হলে মাসে-মাসে শাড়ি কেনা এবং দেদার খরচের জন্য মেয়েদের চাকুরি কী প্রয়োজন? আর এই জন্য তো পুরুষসমাজও মেয়েদের খাটাতে ভয় পেলেও সম্মান দিতে শেখেনি। যার ফলে আজও ট্রামে-বাসে অসভ্যতা, নারীলাঞ্ছনা, পাশবিক অত্যাচার বধূহত্যা বেড়েই চলেছে। সুতরাং মেয়েদের উচিত এইসবের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা। সুন্দর একটি সংসার করে ভাবীকালের দেশনা-গরিকদের সু-মনের অধিকারী করে গড়ে তোলা। যা অল্প শিক্ষিতার চেয়ে সুশিক্ষিতারাই বেশি পারবেন। বর্তমান যুগে এটাই বড় চাকরি। দেশের ছেলেরা চাকুরি পেলে বরং সমাজবিরোধীর সংখ্যা কমবে।

মিস মজুমদার
দমদম

এ পক্ষের সুকন্যা

'এ পক্ষের সুকন্যা' এই শিরোনামে এখনো পর্যন্ত যে মহিলাদের সঙ্গে আপনারা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মহিলা হিসাবে সত্যিই ভালো, মা-বাবার মুখ উজ্জ্বলকারিণী এবং সর্বোপরি মহিলা সমাজের গর্ব। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে যে, ওই সুকন্যাদের পরিপূর্ণ বিকাশে তো আরও কতকগুলো 'ভালো' জিনিসের অবদান ছিল। যেমন – ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো, অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন তাও ভালো।

অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে শুনেছি, যে-কোনো প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারে যখন তার ৫০ শতাংশ বুদ্ধিমত্তা কাজ করে, আর বাকি ৫০ শতাংশ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘরে শিক্ষার পরিবেশ ও মোটামুটি অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বহাল থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বুদ্ধিমত্তার অভাব এই সমাজটার নেই। কিন্তু অভাব রয়েছে সঠিক শিক্ষামূলক পরিবেশের এবং অর্থের। এই সমাজটা বেশ চিন্তাশীল এবং পরিশ্রমী। কিন্তু সেই পরিশ্রমের মূল্য এরা ঠিক পায় না। এক শ্রেণীর লোক এদের শুষে নিতে চায় কিন্তু কিছু দিতে অপারগ। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই সমাজ থেকে বের হয় বেশ কিছু কীর্তিমান মানুষ।

'এ পক্ষের সুকন্যা'য় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা 'সুকন্যা'দের সঙ্গে যদি মাঝে-মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে বড়ো ভালো হয়। বর্তমান আদর্শ-বর্জিত সমাজে তাঁদের কাছ থেকে যদি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মেয়েরা আদর্শ লাভ করে থাকে তাহলে ক্ষতি কি কিছু আছে।

সুমন মুখোপাধ্যায়
নিউ টাউন, বার্নপুর
বর্ধমান

শিশুকে তার মতই মানুষ হতে দেওয়া ভাল

'সুকন্যা'র ১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৫ সংখ্যায় শিকাগো থেকে নীতা মজুমদারের লেখা 'আমেরিকায় ভারতীয় মায়ের ভাবনা' বিষয়টি পড়লাম।

এই সমস্যা-জর্জরিত পৃথিবীতে নীতা দেবী এক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। আসলে মেয়ের (৩ বছরের) সমস্যা থেকে উনি নিজেই নিজের সমস্যা হয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি যদি সত্যই গ্রহণীয় হত তাহলে উনি যেখানেই থাকুন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু ভারতীয় নিয়মে নিজেকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতেন। সকালে ঠাকুরের কাছে ধূপ দেওয়া, গুরুজনদের প্রাতঃপ্রণাম, অতিথি-অভ্যাগতদের নারায়ণ জ্ঞান, সন্ধ্যায় বাতি দেওয়া এই নিয়মগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত পালন করে ভারতীয় সাধারণ ঐতিহ্যকে তিনি নিজগৃহে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বুঝতে না পারলেও, কোনো না কোনো সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গুণাগুণ বুঝতে পারবে এই আশা রাখতে পারতেন। নীতা দেবীকে অন্তত এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়তে হত না। শিশুর সামনে কোনো ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত নেই, যা দিয়ে সে তুলনা করতে শিখবে (যা শিশুরা শিশুকাল থেকে শেখে)। দু নৌকোয় পা না দিয়ে শিশুকে তার মতই মানুষ হতে দেওয়া ভাল। সেখানে থাকবে মায়ের স্নেহের বন্ধন, ভালবাসার বেড়া।

শান্তি শ্রীমানি
ব্লক বি, সল্ট লেক
কলকাতা-৬৪

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সুকন্যার ১৬ – ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় শ্রীসুজয় সোমের লিখিত উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি খুব সময়োচিত ও সুলিখিত। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সিনেমা ও নাটকে নানান রকম কঠিন ও দুরূহ চরিত্রেও খুবই সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের হাততালি কুড়িয়েছেন। বিশেষ করে স্টারে অভিনীত 'শ্যামলী' নাটকে মূক ও বধির নারীর চরিত্রচিত্রণে ও ওই নাটকের সাফল্যের মূলে সাবিত্রীর অবদান উল্লেখযোগ্য। আমাদের

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের বম্বে থেকে ওয়াহিদা রহমান ('অভিযান'), সিমি ('অরণ্যের দিনরাত্রি'), সুহাসিনী মূলে ('ভুবন সোম') এনে বাংলা ছবিতে অভিনয় করানোর কোনো যুক্তিই ছিল না; কেননা ওঁদের মত যোগ্য অভিনেত্রী বাংলায় ছিল, তার মধ্যে সাবিত্রীই একজন। সাবিত্রী যে ক্ষোভের বশে বলেছেন, এই দুই বিখ্যাত পরিচালক তাঁদের ফিল্মে কোনো একটা চান্স দিতে পারেননি এটা সত্যিই অবিচার। গুণী লোকদের প্রতি আমরা অবিচার করে থাকি, যেহেতু তাঁরা সরল, বিশ্বাসী ও সৎ।

ভূপেন বসু ও কল্যাণী বসু-
টেলকো কলোনি
জামশেদপুর-৪

আউটডোরের অনবদ্য রিপোর্টিং

কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত 'শিমুলতলায় ভালবাসা ভালবাসার আউটডোরে' লেখাটির জন্য শ্রীরানা দাসকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রতিবেদক হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এ ধরনের অনবদ্য রিপোর্টিং এর আগে বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে ঘটেনি। শুধু শুটিংয়ের বর্ণনা নয়, গসিপ নয় – অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মন-মেজাজ, তাঁদের বাস্তব জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অনবদ্য। আলোকচিত্রী শ্রীঅর্ধেন্দু রায় ও 'সুকন্যা'কে এইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বজিৎ ঘোষ
ব্যাণ্ডেল, হুগলী

মণিদীপা মুখার্জি ঃ তথ্য সংশোধন

'সুকন্যা'র ১৬ – ৩০ এপ্রিল '৮৫ সংখ্যায় 'এ পক্ষের সুকন্যা' বিভাগে মণিদীপা মুখার্জির যে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে (পৃ-৪৮) তাতে দুটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় কলমের একস্থানে শ্রীমতী মুখার্জির বয়ানে বলা হয়েছে, '১৯৮২-তে সোনোডাইন ইন্টারন্যাশনাল চালু হবার পর আমি ওখানকার ডিগ্রী নিই।' এর ঠিক পরবর্তী লাইনে বলা হয়েছে, 'এরপর যাদবপুর থেকে ১৯৮২-তে ডিরেক্টর নিযুক্ত হই।'

সঠিক তথ্য হবে এরকম ঃ '১৯৮২-তে সোনোডাইন ইন্টারন্যাশনাল চালু হবার পর আমি ওখানকার ডিরেক্টর নিযুক্ত হই।' এবং 'এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২-তে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রী নিই।'

লেখিকা

লাইব্রেরিয়ান ঃ সংযোজন ও সংশোধন

'মেয়েদের কর্মসংস্থান' বিভাগে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট চাকরি প্রসঙ্গে নানা তথ্য দিয়ে কর্মপ্রার্থী মহিলাদের আপনারা সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু তথ্য যদি ভুল থাকে, তাহলেই হয় বিপদ।

গত ১৬ এপ্রিল সংখ্যা 'সুকন্যা'য় শ্রীঅসিত চৌধুরীর লেখা 'লাইব্রেরিয়ান' শীর্ষক প্রতিবেদনটির কথা এই প্রসঙ্গে বলছি। লেখাটিতে কিছু ভুল ও কিছু তথ্যের অভাব ছিল যা সহজেই সংগ্রহ করা যেত সঠিক লোক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

(১) যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিগ্রী কোর্স অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ১ বছরের; ২ বছরের নয়।

(২) পশ্চিমবাংলায় ৬ মাস/৯ মাসের সরকারি স্বীকৃত সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয় নিম্নলিখিত স্থানে ঃ

ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন), পি ১৩৪, সি আই টি স্কিম নং ৫২, কলকাতা-৭০০০১৪

খ) ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার। রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া, ২৪ পরগনা

গ) কালিম্পঙ্ মহকুমা গ্রন্থাগার, দার্জিলিং

ঘ) বাণীপুর বি টি কলেজ। পো ঃ বাণীপুর, ২৪ পরগনা

(৩) ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স ডকুমেন্টাল সেন্টার। কলকাতা শাখায় কোনওরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

(৪) ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার (ডি আর টি সি) বম্বেতে নয়, ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিয়ানদের যে বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়।

রাণা রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
কলকাতা-৩২

ভ্রম সংশোধন

গত ১ – ১৫ মে সংখ্যায় 'সংস্কৃতি সংবাদ ও আলোচনা' বিভাগে (পৃ ৭০) পিনাজ মাশানীর ছবিটি নীনা মেহতার নামে ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

– সম্পাদিকা
সুকন্যা

সুকন্যা

১ জুন ১৯৮৫ সংখ্যা

বনোয়ারিবাদের অন্দরমহল

কয়েকশ বছর আগে দিল্লির এক সম্রাটের অর্থানুকূল্যে নিত্যানন্দ দালাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বনোয়ারিবাদ। নিতান্ত দুঃস্থ অবস্থা থেকে তিনি বড় হয়েছিলেন, পত্তন হয়েছিল একটি বিশাল জমিদারির। এই জমিদারবাড়ির কনিষ্ঠা বধূ উনিশ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়েও অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রায় চার দশক ধরে সযত্নে তাঁর সম্পত্তির পরিচালনা করছেন। বর্তমান রচনাটি নিঃসঙ্গ অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর জমিদার-পত্নীর অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

জেনারেশন গ্যাপ

যুগ পাল্টায়, সমাজ বদলায় – এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে রচিত হয় ব্যবধান। যুগ ধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নব প্রজন্ম আধুনিকতাকে যখন বরণ করে পুরনোরা তখন আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই প্রবন্ধে লেখিকা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে উত্তরণের মধ্যে ধারাবাহিক যে পরিবর্তন ঘটে প্রাঞ্জলভাবে তাই বিবৃত করেছেন।

শিল্পীর চোখে নারী

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে করুণা সাহা সুপ্রতিষ্ঠিতা। দীর্ঘ শিল্পী জীবনে বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি আজকের প্রতিষ্ঠায় পৌঁছেছেন। চলার পথে পেয়েছেন নানা সম্মান, দেখেছেন নানা জগৎ। নারী হয়ে তাঁর চোখে নারীর ভূমিকা কী, তাঁর শিল্প জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন তারই পরিচয় পাওয়া যাবে এই সাক্ষাৎকারে।

অভিমত

মেয়েরা চাকরি করলে সন্তান উপেক্ষিত হয় কিনা – বর্তমান সময়ে এটা খুবই জরুরী প্রশ্ন। আজ সমাজে ব্যাপকহারে মেয়েরা চাকরিজীবী। সুতরাং এই নিয়ে তাদের মনেও বহু চিন্তাভাবনা দোলা দেয়। তাদের সেই ভাবনা কি ধরনের জানবার জন্য ছ'জন চাকরিজীবী মায়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করেছিলেন। এই লেখাটিতে সেই সাক্ষাৎকারকে তুলে ধরা হয়েছে।

দীপ্তি নাভাল

আজকের হিন্দি ফিল্মের অনেকটা জুড়েই আর্ট ফিল্ম। যা চলচ্চিত্রকে এক নতুন গতি এনে দিয়েছে। আর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে অভিনেত্রী হিসেবে দীপ্তি নাভাল আজ বিশেষ পরিচিতা। তাঁর ধ্যানধারণায় ফিল্মি জগৎ, অভিনয়, অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ, সর্বোপরি তাঁর নতুন বিবাহিত জীবনের ওপর তিনি এই সাক্ষাৎকারটি আমাদের দিয়েছেন। যা একান্তভাবেই বুদ্ধিদীপ্ত ও অনন্য।

নীলকণ্ঠের নেপথ্য শিল্প

দিলীপ রায়ের আগামী ছবি 'নীলকণ্ঠ' দুর্বিপাকে পড়া বিপথগামিনী একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে। লতা নামে নিষিদ্ধ পল্লীতে সে আদিম ব্যবসায়ে লিপ্ত। ছবিটিকে বাস্তব করার জন্য দিলীপ রায় সোনাগাছির পতিতালয়ে দিনের পর দিন শুটিং করেছেন। সেখানকার বাবু, বাড়িউলি, দালাল, আড়কাঠি সমস্ত চরিত্রকে ক্যামেরার সামনে হাজির করেছেন তিনি নিখুঁতভাবে। পতিতাদের জীবনে প্রেম-ভালবাসা, সন্তানের প্রতি মায়া-মমতাকে দরদী মন নিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। এই লেখাটি সেই ছবিরই চিত্রকাহিনী ও শুটিং-এর পরিচিতি।

এছাড়া সকল নিয়মিত বিভাগ



নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী। শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী —শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারি
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম®
রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপুর
দুধে মিশিয়ে নিন
এখন
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন প্যাকে
Nestlé
Nestum
baby cereal
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে!
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
Nestlé



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

'ঘুণপোকা' থেকে 'পারাপারে' পৌঁছতে পৌঁছতেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে তাঁর আলাদা জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। দামামা বাজিয়ে নিজের আগমনকে তিনি ঘোষণা করেননি, তাঁর লেখার ভিন্ন স্বাদ জীবনের গভীরতা অন্বেষী পাঠক পাঠিকাকে টেনেছে খুব ভেতর থেকে। রিপোর্তাজধর্মী বাংলা উপন্যাসের পালে যখন উন্দাম হাওয়া, তখন এক অন্য বোধের দাঁড়ে তিনি বসেছেন একক কান্ডারী হয়ে। তাঁর লেখায় বিষাদ আসে কিন্তু কখনোই জীবনের মহিমাকে আড়াল করে নয়। ছোটদের জন্যে তাঁর লেখাগুলোতে আবার ভিন্ন এক রৌদ্রকরোজ্জ্বলতা। সম্প্রতি 'আক্রান্ত' উপন্যাসের জন্যে তিনি পেয়েছেন শিরোমণি পুরস্কার। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র নিয়ে কারো কারো যে কখনো কখনো খানিকটা আপত্তিও থাকে – সেটাও লেখকের অজানা নয়। বর্তমান রচনাটিতে সেই সমস্ত স্পর্শকাতর প্রশ্নাবলীরও আলোচনা হয়েছে খোলাখুলিভাবে।

'কেউ কেউ আমাকে নারীবিদ্বেষী বলেছেন'

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

'আমার সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে কেউ কেউ আমাকে নারীবিদ্বেষী বলেছেন। বিশেষ করে আমার 'ওষুধ' গল্প প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করা হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু আমি জানি আমি কিছুতেই নারীবিদ্বেষী হতে পারি না। আমার পক্ষে নারীবিদ্বেষী হওয়া সম্ভব নয়।' একথা খুব স্পষ্ট করেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বললেন, তাঁর জীবনে তাঁর মার ব্যাপক ও গভীর ভূমিকার কথা মনে করতে করতে।

বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা তুলনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, সমাজে এবং সংসারে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি জোরালো, অনেক বেশি ধারালো। মানুষের সমাজকে ধরে রাখার ব্যাপারে নারীর দায় এবং দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। নারীর যেখানে মায়ের ভূমিকা, মানুষের পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় আর কোনো ভূমিকা হতে পারে না।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নিজের লেখা থেকে খুব প্রিয় কয়েকটি নারী চরিত্র বেছে দেওয়ার কথা বললে উনি বলবেন, 'আমার নিজের লেখা আমার প্রিয় নয়।' তবু তার মধ্যে থেকেও যে কয়েকটি প্রিয় নারী চরিত্রের উল্লেখ করবেন উনি সবকটিই মা চরিত্র। 'মা বা মায়ের মতো যারা তাদের কথা লিখতে গিয়ে আমার ভাল লেগেছে খুব। পারাপারে এক মায়ের কথা আছে। আছে উজানে, যাও পাখিতে। আমার অনেক ছোটগল্পে আছে মায়ের কথা।'

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নিজের জীবনের নারী সম্পর্কে রেখাচিত্রটি খুব ছোট করে এইরকম – ছেলেবেলা মা, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমার অশেষ স্নেহ আর নিরাপত্তায় বড় হয়ে ওঠা। দেশভাগের পর বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। সব ফেলে হস্টেলে এসে থাকা তাঁর পক্ষে ছিল বেশ কষ্টের। একটানা সতেরো আঠারো বছর কেটেছে নারী-বিবর্জিত জীবন। অভাব বোধ তাঁর অনুভূতিকে তখন আচ্ছন্ন করেছে ঘন করে। কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছেন কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই ছিলেন মুখচোরা। এখন যেমন খুব সহজে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তখন তেমন পারতেন না। এখনো অবশ্য সহজে কোনো অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। নিজের এই প্রকৃতির জন্যেই ওই সময়ে কোনো নারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু বাইরের এই দূরত্বটা থাকলেও মেয়েদের বরাবর লক্ষ্য করে গেছেন বেশ খুঁটিয়ে। এরপর বিবাহিত জীবন শুরু। তাঁর দুই সন্তানের মধ্যে কন্যারত্ন একটি।

'মেয়েদের নিয়ে আমাদের সমাজে চিন্তাভাবনা যথেষ্ট হয়নি। কংক্রিট কিছু গড়ে ওঠেনি। মেয়েদের অবাধ বিকাশ, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো নষ্ট করে তাদেরকে যদি ছেলেদের ছাঁচে আনার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা হবে খুব দুঃখজনক। মেয়েদের মধ্যে এখন যে অধিকার-সচেতনতা এসেছে সেটা যেমন ভাল লাগে, তেমনই খারাপ লাগে তারা যখন ছেলেদের অনুকরণ করে। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একটা মেয়েকে চারদিন লক্ষ্য করার পর আমি বুঝতে পারলাম সে ছেলে নয়, মেয়ে। এটা আমার কাছে সত্যিই একটা ট্র্যাজিক এক্সপিরিয়েন্স।

কথায় কথায় ইন্দিরা গান্ধীর একটি মন্তব্য মনে পড়ে গেল ওঁর। মানব সমাজের উন্নতির জন্যে শুধু নারীর মুক্তি নয়, সেই সঙ্গে পুরুষের মুক্তিটাও খুব প্রয়োজনীয়। পুরুষ যে তার অভ্যাসের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে, কতকগুলো পুরোন ধারণার শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে, সেখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের পুরনো অভ্যাস ও ধারণা থেকে মুক্তিটাও জরুরী। আর নারীমুক্তির গতিটা যদি শুধুমাত্র বাইরের বদলটাতেই আটকে থাকে, মেয়েদের পোশাক, চুলের ছাঁট ইত্যাদিই বড় হয়ে ওঠে, তাহলে তার তলায় আসল উদ্দেশ্যটা চাপা পড়ে যাবে। এটা একধরনের পুরুষের

চাহিদা। মেয়েরা যদি নিজেদের ভোগ্যা বা পণ্যা মনে না করে, তবে তাদের ওরকম হওয়ার কথা নয়। একটা মেয়ে যদি ম্যাসকুলার হয়, চেষ্টা করে যদি গোঁফ দাড়ি গজিয়ে ফেলে সে – সেটা কি খুব অভিপ্রেত?

'আমার মতে মেয়েদের অধিকার পুরুষের চেয়ে প্রাকৃতিকভাবেই বেশি। মেয়েরা গর্ভধারণ করে এবং পুরুষেরা মাতৃশাসিত। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি বলতাম, সমাজবিধিতেও মেয়েদের অধিকার পুরুষদের চেয়ে বেশি থাকবে।'

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখায় আজকের জীবনের যে জটিল ছবি আমরা দেখি, নরনারীর জীবনের সেই জটিলতার একটা বড় অংশের মূলে আছে বিয়ে – ভেঙে যাওয়া সেপারেশন বা ডিভোর্সের সমস্যা। তাঁর লেখায় আজকের বিপন্ন সময় এবং সেই সময়ের বিচিত্র তরঙ্গ আঘাতে আঘাতে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে, মানুষের যে অমল আত্মাকে তিনি অন্বেষণ করেন অপার বেদনাবোধে সেখানে সহজেই লক্ষ্য করা যায় – নরনারীর এই বিযুক্তি প্রায়শই জীবনের! সংকটকে আরো অস্থির এবং গভীর করে তুলছে। এই ভাঙাই নরনারীর নিরাশ্রয় এবং অসহায়তার বিপদকে আরো তীব্র করে তুলছে। অসংলগ্ন, ভাঙা, ডুবন্ত সেইসব স্ত্রীপুরুষের অসহবাসে তাঁর লেখা আলো ফেলে ঘরে ঘরে। লেখকের কথাতেই বলা যায়া, 'বিবাহ মানে তো বিশেষ রূপে বহন। একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষের সুখ দুঃখের ভাগ বহন। ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধকে ছাপিয়ে দুজনের অধিকারবোধ যখন আলাদা আলাদা দৃষ্টি কোণ থেকে বড় হয়ে উঠতে থাকে তখন আর সেই বহন ক্ষমতা থাকে না। বহনের সেই ইচ্ছেটাই নষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। সমাজের হাওয়া এটাকে খানিকটা বাড়ায় সন্দেহ নেই। কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স করে আসার রাস্তাটাও কঠিন নয়। বিচ্ছেদটা শহরেই বেশি। মেয়েদের চাকরি তার অনেকগুলো কারণের যেমন একটি, তেমনি আধ্যাত্মিকতা থেকে সরে আসা, আদর্শবোধের অভাব – এগুলোর ভূমিকাও অনেকখানি।'

একাধিকের প্রতি আসক্তি ব্যাপারটা ছেলেদেরই। মেয়েরা মনোগামী, মেয়েরা ঘর ভাঙতে চায় না। সমাজের সব স্তরে সমস্যাটা অবশ্য এক নয়। নিচুতলার মানুষদের পারিবারিক বন্ধন তেমন জোরালো নয়। মেয়েরা সেখানে মারধোর খায়, পয়সার অভাব না পেটের খিদে তাদেরকে ভাঙে। প্রসঙ্গত 'সোনার ঘোড়া' গল্পের কথা এসে পড়ল। অন্য স্তরে, তাঁর গত শারদসাহিত্যের একটি উপন্যাস 'জাল'–এ তিনি যাজ্ঞসেনীর তামিল বাবা আর বাঙালি মায়ের পঁচিশ বছরের নির্বিবাদী জীবনে আচমকা ডিভোর্স সংকট এল। উঁচুতলার ওইখানেও পারিরিক বন্ধন শিথিল। সেখানে পুরুষ পৃথিবী দাবড়ে বেড়ায়, স্ত্রী শানায় ছলনা। অন্য এক নিরাশ্রয় এদেরও ভাসায়। সমাজের এই স্তরের যাজ্ঞসেনীর সবুজসাজ থেকেও স্নিগ্ধতা সরিয়ে রাখেন লেখক, বোধহয় সুপরিকল্পিত ভাবেই, ... 'দরজায় একটি লাউডগা সাপ ফণা তুলে দুলছে। এত সবুজ আমি আর কাউকে বড় একটা দেখিনি। টিপ, নখ, ঘড়ির ব্যান্ড থেকে কানের দুল অবধি সবুজ। ঠোঁটে সবুজ লিপস্টিক, পরনে সিল্কের সবুজ চুড়িদার, সবুজ ওড়না, পায়ে সবুজ চপ্পল, চোখমুখ ফুটফুটে এবং ধারালো। শরীরটা ছোটখাটো এবং ছিপছিপে। একটু নজর করে দেখলে সাপের সঙ্গে অনেকগুলো পয়েন্টে মিল আছে।'

অথচ এই যাজ্ঞসেনীর আদলে বিষাদ জড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে তা পেয়ে যায় অন্য মাত্রা। দূরত্ব সরে যায়! সমমর্মিতার কলমে বিষাদের শিল্পীকে কি চেনা যায়। 'দুঃখ যে মানুষকে কতটা সুন্দর করে তোলে তা যাজ্ঞসেনীকে দেখলেই বোঝা যায়। এমনিতেই যাজ্ঞসেনী যাকে বলে ফুটফুটে। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি মাত্রা যোগ হয়েছে ওর গম্ভীর, বিষণ্ণ, দুঃখী মুখখানার গভীরতা, উদাস চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে আমার পিছু নিয়ে ওপরে উঠে এল। শরীরে কোথাও কোনো চঞ্চলতা নেই। ভারী ধীর স্থির আত্মমগ্ন এক বয়স্ক মহিলা যেন।'

জেন অস্টেনের মতো মানুষকে দেখার ধারালো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লেখিকাও দুটি পুরুষের একান্ত নিভৃতে সংলাপ রচনায় অনধিকার বোধ করেছেন। তার কারণ, লেখিকার জীবন অভিজ্ঞতায় দুটি পুরুষের একান্তে সংলাপ শোনার প্রত্যক্ষ সঞ্চয় নেই। এর উল্টোটা যেখানে, একজন পুরুষ লেখক কীভাবে আঁকবেন নিছক প্রমীলা রাজ্যের ছবি। নিখাদ মেয়েমহলের বর্ণনা, শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে সংলাপ বিনিময় – এসব ক্ষেত্রে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলম কীভাবে এগোয়?

'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই সব নয়। কান পেতে শোনা, ধারণা করে নেওয়া – এগুলোও যথেষ্ট কার্যকরী। লক্ষ্যটা সব সময়েই থাকে, একসঙ্গে অনেক মেয়ে যখন থাকে। লক্ষ্য করেছি সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। শোনে কম। আর হাসে। কারণে অকারণে হো হো করে হেসে ওঠে।' বলে ছোট্ট একটি অভিজ্ঞতার কথা জানালেন উনি, 'একদিন একটি লেডিজ কমনরুমের কাছাকাছি আমাকে বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম, একটু করে কথা হচ্ছে, আর সে কথায় হাসির বিষয় থাকুক বা না থাকুক ঘন ঘন হাসি উঠছে ঢেউয়ের মতো। একটা মিলতে না মিলতে আর একটা। তারপর আরো একটা।'

আশাপূর্ণা দেবী গৃহিণী হয়েও জীবনের যেকোনো সীমানায় তাঁর লেখাকে নিয়ে যেতে পিছিয়ে আসেননি। তিনি লিখেছেন এবং লিখেছেন নির্ভুল কলমে। আশাপূর্ণা দেবী প্রসঙ্গেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মেয়েরা খুব সুন্দর চিঠি লেখে। কথাটা সত্যি। আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় আছে সেই নিবিড়তা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিবিড়ভাবে দেখার যত্ন।'

ছেলেবেলা থেকেই ওঁর পরিচয় মেয়েদের লেখার সঙ্গে। লেখিকা বলে নয়, শুধু লেখার টানেই অবশ্য তখন থেকেই পড়েছেন প্রভাবতী, আশাপূর্ণা, সীতাদেবী লীলা মজুমদার পরে প্রিয় লেখিকাদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন, কবিতা সিংহ। বিদেশী লেখিকাদের মধ্যে সেই মুহূর্তে ওঁর যে কয়েকজন লেখিকার নাম মনে পড়েছিল তার মধ্যে প্রথমেই ছিলেন আঙ্কল টমস কেবিনের লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার স্টো। ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী – ইতালির লেখিকা গ্রাসিয়া দেলেদা। ছিলেন গুড আর্থের লেখিকা পার্ল বাক।

মেয়েদের লেখায় অনুপুঙ্খতার আলাদা স্বাদ থাকে। আগাথা ক্রিস্টির একটি কাহিনী–অংশ উল্লেখ করে উনি বললেন, 'একটা ঘরের কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা – ঘর সাজানোর মধ্যে কিছু এদিক–ওদিক হয়েছে কিনা – সেটা জানার জন্যে ডাকা হল ভ্যালেকে – যে ঘরটা সাজায়। সে এসে বলেছিল – চেয়ারটা ঠিক জায়গায় নেই। এই খুঁটিনাটি, সামান্য এদিক–ওদিক, মেয়েদের চোখে ধরা পড়ে সহজেই।'

নিজের লেখা নিয়ে বসেন যখন, আলাদা করে পাঠিকাদের কথা ভাবেন না, তবে লক্ষ্য করেছেন, মেয়েরা অনেক বেশি পড়ে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে তাঁর কাছে চিঠি পাঠান যাঁরা – তাঁদের মধ্যে শতকরা আশিভাগই পাঠিকা।

সাক্ষাৎকার : সুনীল দাশ

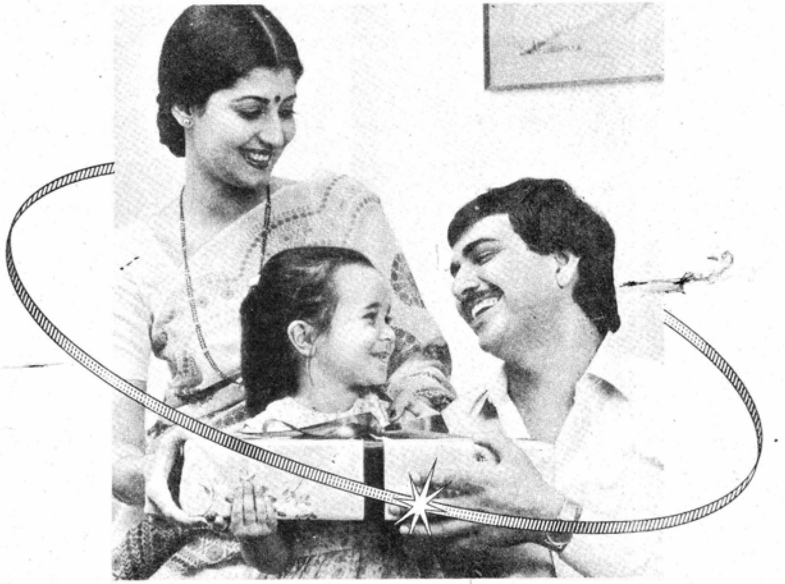
রান্না প্রতিযোগিতা

'সুকন্যা'-র রান্না প্রতিযোগিতায় পাঠিকাদের কাছ থেকে যে সাড়া আমরা পেয়েছি তার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগিনীকে ধন্যবাদ। বহু সংখ্যক রন্ধনপ্রণালী থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে যাঁদের রান্না নির্বাচিত করেছি তাঁদের নাম এখানে প্রকাশিত হল। এঁদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজেদের রান্নার নমুনাসহ আমাদের দপ্তরে উপস্থিত হতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বিচারকমণ্ডলী রন্ধন-পারিপাট্য এবং স্বাদের চমৎকারিত্ব অনুসারে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করবেন।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের নাম –

১। মঞ্জুশ্রী রায় ২। সুপ্রিয়া ঘোষ ৩। বনিতা সিনহা ৪। প্রণতি লাহিড়ী ৫। সুস্মিতা সরকার ৬। সমতা ঘোষ ৭। স্বর্ণলতা মিত্র ঘোষ ৮। কেয়া বসু ৯। অঞ্জলি রায় ১০। রীতা রায় ১১। ঝুনু লাহিড়ী ১২। বিজলিপ্রভা দত্ত ১৩। মঞ্জুশ্রী কুশারী।

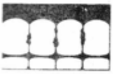
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!



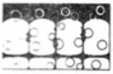
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর, কোলগেটের তাজা মিন্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

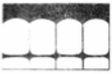
প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।



দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।



কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবানু হ'তে দেয় না।



ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।



B84.55 Ben

কি তাজা মিন্টি স্বাদ!

উচ্চশিক্ষায় প্রথম লোধা নারী ঃ চূনী কোটাল



যে বাড়ির লোকেদের কোনোদিন একবেলা, আবার দিনের পর দিন কাটাতে হয় অনাহারে, সেই পরিবারে শিক্ষার কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এরকমই এক পরিবারে জন্ম চূনী কোটালের। চূনী দেবীই লোধা তরুণীদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। তার ভাষায় দেশে যে ৩৮টি উপজাতি রয়েছে তার মধ্যে লোধা উপজাতিই সবচেয়ে অনগ্রসর ও চরম অবহেলিত। কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পথে তাকে এক দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। নিত্যসংগী হিসাবে পেয়েছেন শুধুমাত্র সমস্যা। এই সমস্যার প্রাচীরগুলো ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যাওয়ার কোন ফাঁকে – মা যামিনী দেবী তাকে ফাঁকি দিয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার শালবনী থানার গোয়ালডিহি গ্রামের শম্ভুনাথ কোটালের সাত সন্তানের সর্ব কনিষ্ঠা চূনী কোটাল। চার বোন, তিন ভাই – তিন দিদিই বিবাহিতা। বড়দা ও ছোড়দা সরকারি চাকরিরত। মেজদা অশীতিপর বৃদ্ধপিতা ও গ্রামের ভিটেটুকুর জিম্মায় রয়েছেন।

চূনী দেবীর প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রামেরই স্কুলে সম্পন্ন হয়। ক্লাস এইট পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়াশোনার পর ভর্তি হন গোয়ালডিহি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে সাতপাটি হাইস্কুলে। ওই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার অ্যাডভেঞ্চার – পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ মেলেনি। ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে। গ্রাম থেকে দৈনিক বাসে কলেজ যাতায়াত করা, আবার কলেজ থেকে ফিরে বিধিবিমুক্ত (Non-formal) বিদ্যালয়ে ৭৫ টাকা মাসিক পারিশ্রমিকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। যার ফলে পড়াশোনায় যথেষ্ট সময় দিতে না পারায়, স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এগিয়ে চলার নেশায় তখন ডিভিসনের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে মেদিনীপুর কলেজেই বি এ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে গেলেন। মেদিনীপুর কলেজ হল এক অনন্য ইতিহাসের সৃতিকাগার।

১৯৮৫ সালে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল ভাগ্যদেবী আজীবন সংগ্রামের সিদ্ধির আসনে বসিয়ে দিয়েছেন ব্রতচারিনীকে। সাবজেক্ট হিসাবে ছিল – ইকনমিকস, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও ইতিহাস। ইনকমিকসেই বেশি নম্বর পেয়েছেন।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য প্রথম বর্ষে পড়ার সময় ১৯৮৩ সালে চূনী দেবী চাকরি পেয়ে যান। প্রথম কর্মস্থল ঝাড়গ্রাম বি ডি ও অফিসে। এই অফিসের খুবই কাছে আর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী লোধা তরুণ প্রথম গ্র্যাজুয়েট শ্রী প্রহ্লাদ ভুক্তা, আই টি ডি পি অফিসে কর্মরত।

চূনী দেবীকে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা জিগোস করলে অতি কষ্টে প্রবল আবেগ সংযত করে বললেন, সে এক দুঃসহ যন্ত্রণার কাহিনী। বাবার মুখে শুনেছি, অনেক আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল, বেশ কিছু জমি-জিরেতও ছিল। কিন্তু জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে সমস্ত জমিজমা খুইয়ে বাবা কপর্দকশূন্য হন। চরম দারিদ্র্যের জ্বালায় বাবা গৃহত্যাগী হন। এর ফলে সংসারের হতশ্রী অবস্থাটা আরো বেশি করে নগ্ন হয়ে পড়ল। বাবার অনুপস্থিতি আটজোড়া চোখের সামনের আকাশটাকে হতাশার কালো মেঘে ঢেকে ফেলল। মা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বাবার ফেলে যাওয়া বিরাট দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিলেন। যেটুকু জমি অবশিষ্ট ছিল – তাতে রক্তজল করা পরিশ্রমে সোনার ফসল তুলে আর অন্যদিকে গরু ছাগল পালন করে বিরাট সংসার কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে মা চালাতে লাগলেন। বড়দাও সংসারের দারিদ্র্যের জ্বালা সইতে না পেরে বাবার পথেই পা বাড়ালেন। এসব সত্ত্বেও মা নির্বিকার, অচঞ্চলা। এই দুঃখও তাঁকে নাড়া দিতে পারল না, কারণ তখন তাঁর মন – আঘাতে আঘাতে চুরমার। পরে জানতে পেরেছিলাম বড়দা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিনের পর দিন জনমজুর আর রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, কঠিন সংগ্রাম করে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। তারপর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ১৯৭৭ সালে কংসাবতী প্রকল্পে করণিকের চাকরি পেয়ে যান। দাদার রোজগারে সংসারেএকটু সুখের মুখ দেখা গেল। দাদা এখন শালবনী থানার পিড়াকাটায় কর্মরত। তারপর ছোড়দাও স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। ৮৩ সালে আমার সংগে ছোড়দাও চাকরি পান। কর্মস্থল বেলদায় নারায়ণগড় ব্লক অফিসে।

চূনী দেবীকে এই প্রতিবেদক বলেন – ঝাড়গ্রাম মহকুমায় যে সমস্ত লোধাদের বসবাস তাদের কথা বিবেচনা করে – আপনার পক্ষে শিক্ষার পথে এতদূর অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট বিস্ময়কর। এ প্রসংগে চূনী দেবী জানান তাদের গ্রামে যে ১৫টি পরিবার রয়েছেন –তাদের সকলেই পড়াশোনার ব্যাপারে সচেতন। বোধহয় এই কারণেই আমি এতটা রাস্তা এগোতে পেরেছি। তাদের গ্রামে চূনী দেবীর পরিবারই একমাত্র চাকরিজীবী। অন্যেরা চাষবাস, পশুপালন ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে দিনযাপন করেন।

চূনী দেবীর এই সাফল্যে – কলকাতা, মুদ্রাজ, আহমেদাবাদ, আসাম প্রভৃতি জায়গা থেকে সাংবাদিক ও প্রথিতযশা ব্যক্তিরা অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছেন একুশ বছরের এই তরুণীকে। এর মধ্যে বেতার, দূরদর্শন ও বহু অগ্রগণ্য দৈনিক ও সাময়িকীতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন চূনী দেবী।

বর্তমান প্রতিবেদক সাক্ষাৎকার নেবার সময় একটা জিনিস খুব সযত্নে লক্ষ্য করেছেন – তা হল চূনী দেবী যে সমাজ থেকে এসেছেন তার অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করলে – এই বিরাট সাফল্যেও তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। স্মিতহাস্যে, নিরহংকার ব্যবহারে সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। নিজের কথা বলার চেয়ে তার সমাজের দূর্দশার কথা লেখার জন্য আগাগোড়া অনুরোধ জানালেন, যদি লোধা সমাজের ন্যূনতম কল্যাণও হয় – তবে সেটাই হবে তার কাছে সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে চূনী দেবীর সুচিন্তিত মতামতটি ভেবে দেখার মত। তার মতে একেবারে শিক্ষার শুরু থেকে লোধা শিশুদের ভরণ-পোষণের ও শিক্ষাদানের ভার সরকার নিলে – তাদের মা-বাবার মনে শিক্ষার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাতে পারে। এ প্রসংগে তিনি বলেন – লোধা শিশুদের অন্যান্যদের (General Caste) সংগে হস্টেলে রাখলে তাদের সামাজিক অনগ্রসরতার অবসান ঘটতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানালেন তিনি, ঝাড়গ্রাম শহরের উপকণ্ঠে পুরাতন ঝাড়গ্রামস্থিত সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ স্কুল হস্টেলে এখন বিশ জন লোধা ছাত্রী অন্যান্যদের সংগে থেকে পড়াশোনা করছে। দেখা গেছে তারা সকলের সংগে বেশ মানিয়ে নিয়েছে, শুধু তাই নয় যথার্থ সামাজিক আচারব্যবহারও রপ্ত করে ফেলেছে। সরকারের তরফ থেকে এ-জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয়ে হস্টেল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। চলছে নতুন স্কুল ভবন নির্মাণকার্য। সুপারিশ করা হয়েছে প্রত্যেকটি রুমে যেন অন্যান্যদের সংগে একটি করে লোধা ছাত্রীকে রাখা হয় – যার ফলে এদের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ আরো মসৃণ হবে।

এতক্ষণ তো হল লোধা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভ করার পথে প্রতিবন্ধকতা ও তার সমাধান বিষয়ে আলোচনা। এবার দেখা যাক যারা বহু বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে শিক্ষালাভ করেছে, তারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। এ প্রশ্নের উত্তর নির্মম হলেও সত্য। আজও মেদিনীপুর জেলার প্রায় শ'দুই – ক্লাস ফাইভ থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করা লোধা শিক্ষিত বেকার হয়ে বসে রয়েছে। অথচ এদের মধ্যে থেকে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, বনরক্ষী বা দৈহিক শ্রমের কাজগুলিতে নিয়োগ করা যেত। এবং তা করলে এদের পক্ষে শিক্ষার সার্থকতা ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। এর আর একটা দিকও রয়েছে। যদি লোধা অধ্যুষিত এলাকার প্রাইমারী স্কুলগুলিতে এদের মধ্যে থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তবে তারা অধিকতর সহানুভূতি ও আগ্রহের সংগে শিক্ষাদান করবে – যা লোধা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে একান্তই প্রয়োজন। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে শিক্ষকরা অভাবী নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা অজ্ঞ কথাবার্তার জন্য লোধা শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। লোধারা আশৈশব বন্য পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে অরণ্যপ্রকৃতিকে অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে ভালোভাবে চেনে ও ভালোবাসে। তাই তাদের বনরক্ষী বা বনের যে কোনো কাজে নিয়োগ করলে বনসম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হতে পারে।

বিশ্বরঞ্জন ভকত

চোখের দেখা ঃ নারী– পুরুষের মৌলিক প্রভেদ

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

হাতের কাছে একটি পেন্সিল আছে আপনার ? আছে ? বেশ ! এবার নিচের চার্টটির দিকে নজর দিন। বাঁদিকে তিরিশটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরপর সাজানো আছে। প্রতিটি পড়ে বিচার করুন এটি কার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নারী, না পুরুষের ? তারপর আপনার যা মনে হয় ডানদিকের সেই ঘরটিতে একটি দাগ দিন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	নারী	পুরুষ
১। স্বাধীনচেতা (independent)		
২। আবেগ প্রবণ (emotional)		
৩। যুক্তিবাদী (rational)		
৪। আত্মনির্ভর (self reliant)		
৫। ধর্মভীরু (religious)		
৬। রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে না (does not use harsh language)		
৭। নরম মন (gentle)		
৮। সংসারের কাজ ভালবাসে (enjoys housework)		
৯। পৃথিবীর সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিবহাল নয় (is not very worldly wise)		
১০। বিপজ্জনক কাজ করতে আগ্রহী (takes risk)		
১১। ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective)		
১২। উচ্চাকাঙ্ক্ষী (ambitious)		
১৩। অঙ্ক ও বিজ্ঞান ভালবাসে (enjoys mathematics and science)		
১৪। বেশি কথা বলে (talketive)		
১৫। ধীর স্থির, শান্ত ও নম্র (passive and docile)		
১৬। প্রতিযোগিতাপরায়ণ (competitive)		
১৭। সোজাসুজি কথা বলে (direct)		
১৮। সেবাপরায়ণ (helpful)		
১৯। সাজপোশাকে মন বেশি (concerned about good looks)		
২০। নেতৃত্ব নিতে ইচ্ছুক (willing to lead)		
২১। কৌশলী (devious)		
২২। অন্যের ইচ্ছা সম্বন্ধে বেশি সচেতন (concerned about others wishes)		
২৩। রাজনীতি ভালবাসে (enjoys politics)		
২৪। দয়ামায়া বেশি (kind hearted)		
২৫। অন্যের কথা সহজে মেনে নেয় (influenceable)		
২৬। কঠিন (tough)		
২৭। কর্তৃত্ব ভালবাসে (dominant)		
২৮। শিল্প, কলা, সাহিত্য ভালবাসে (enjoys art and literature)		
২৯। ব্যবসায় পারদর্শী (good in business)		
৩০। সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে (takes decisions easily)		

এবার দেখুন তো নারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫ আর ২৮ নম্বরে দাগ দিয়েছেন কিনা। দিয়েছেন ? বেশিরভাগ মানুষই আপনার সঙ্গে একমত হয়ে নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এগুলিকেই বেছে নেবে। একে বলা হয় স্টিরিওটাইপ (stereotype) করা। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে মহিলামাত্রেরই এইসব বৈশিষ্ট্য আছে, মেয়েরা সবাই এক ছাঁচে তৈরি।

এই পৃথিবীর বহু সমাজই মনে করে পূর্বোক্ত চার্টের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কিছু নারী আর কিছু পুরুষ চরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় মহিলাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পুরুষদের একেবারে উল্টো। যেমন, পুরুষ স্বাধীনচেতা – নারী অধীন, পুরুষ যুক্তিবাদী – নারী যুক্তির ধার ধারে না, পুরুষ আত্মনির্ভর – নারী অন্যের ওপর নির্ভর করে, পুরুষ নিজের সম্পর্কে উঁচু আশা ধরে – নারীর মধ্যে ততটা অ্যাম্বিশন নেই। আমরা মনে করি এইসব নারীজনোচিত বৈশিষ্ট্য মহিলাদের উজ্জ্বল করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যের স্ফূরণই তাদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের লক্ষণ।

নারী ও পুরুষের মধ্যে কি তাহলে মৌলিক কোনো প্রভেদই নেই ? নিশ্চয়ই আছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল দৈহিক। এই দৈহিক পার্থক্য আমাদের সহজাত। তবে নারী ও পুরুষের মানসিক ও চারিত্রিক পার্থক্য তাদের দৈহিক পার্থক্যের মতো এত বিশাল কখনোই নয়, এবং আদৌ সহজাত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মনোবিজ্ঞানের এ এক শক্ত বিতর্ক। আমাদের কোন বৈশিষ্ট্য সহজাত আর কোনটা আমরা বড় হতে হতে শিখেছি তা আলাদা করে দেখানো প্রায় অসম্ভব। মানুষ জন্মাবার সময় তার কিছু সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। অনেক মনোবৈজ্ঞানিকের মতে এগুলি খুবই মৌলিক, শিশুর বেঁচে থাকার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় শিশুর আসল শিক্ষা। সে চারপাশের অন্যান্য মানুষ, বিশেষ করে মা বাবার আচরণ লক্ষ্য করে, শেখে। মা বাবা, ভাই, বোন, দাদু, ঠাকুরমা তার কোনো কোনো আচরণকে প্রশংসা করে; সেগুলি সে পরমোৎসাহে আবার করে। আর কিছু কিছু ব্যবহার ও কাজ সমাজে নিন্দা পায়, বাবা মা শাস্তি দিয়ে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বারণ করেন। শিশু অন্তত প্রকাশ্যে সেই কাজগুলি আর করে না। এমনি করেই তৈরি হয় সামাজিক মানুষ। বিভিন্ন নীতি নিয়ম শিখে শিশু একদিন সমাজের নির্ভরযোগ্য সদস্য হয়ে ওঠে। এরপর তার কোন আচরণটি সহজাত আর কোনটি শিক্ষাগত তা আর বিচার করা যায় না।

> পৃথিবীর সব সমাজে বহু যুগ ধরে একটি ধারণা প্রচলিত আছে – নারী, পুরুষের থেকে বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন। নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তাকে পরনির্ভরশীল, আবেগপ্রবণ, যুক্তিহীন, উচ্চাশাহীন, সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন বলা হয়েছে। তারা নাকি পুরুষবিহীন অবস্থাতে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত খুঁজে পান না ! এইসব ধারণা কতখানি সত্য কিংবা অসত্য, সে বিষয়ে বিশদভাবে মনোবিজ্ঞান-সম্মত মননশীল আলোচনা করেছেন লেখিকা এই প্রবন্ধে।

নারী ও পুরুষের আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাত, না সামাজিক শিক্ষার ফল এ নিয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে। এই বিতর্কটি একটি বিশেষ কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভিন্ন। মহিলারা সাধারণত সন্তান পালন ও সংসারের কাজ করেন, আর পুরুষ করেন বাইরের জগতের কাজ। এই শ্রমবিভাগের যুক্তি নারী ও পুরুষের সহজাত চরিত্রের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ধরে নিই, নারী সহজাতভাবেই ধীর স্থির, মায়ামমতার প্রতীক, সেবাপরায়ণ, রান্নাবান্না, সেলাই ফোঁড়াই ও সন্তানপালনের কাজ ভালবাসে, তাই বাড়ির কাজই তার পক্ষে বেশি উপযুক্ত। সংসারের কাজেই তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই যুক্তির ভিত্তিতেই যুগ যুগ ধরে মহিলারা তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছেন। কিন্তু

সত্যিই কি এই বৈশিষ্ট্যগুলি নারীর সহজাত ? এটা সত্যি যে, জৈবিকভাবে নারী সন্তান প্রজননের ক্ষমতা ধরে। কিন্তু সে তো শুধু জৈবিক ব্যাপার। মানসিক ও চারিত্রিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা নারীর সহজাত বৃত্তি বলি, তা যদি প্রকৃতপক্ষে সহজাত না হয় তাহলে নারীর সংসারের কাজে আবন্ধ থাকার পক্ষে সব যুক্তিই মিথ্যে হয়ে যায়। আর এর সঙ্গে ধসে পড়ে পুরুষের বাইরের জগতে একচেটিয়া আধিপত্য চালিয়ে যাবার সপক্ষে যুক্তি।

ছোটখাট বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিলে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে আগ্রাসী ব্যবহার (aggressiveness), আত্মনির্ভরশীলতা, ভীতি ও আশঙ্কাবোধ, সমব্যথা, সক্রিয়তা (activity) ও স্বকীয়তার ব্যাপারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মহিলা ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা সহজাত কিনা একটু চিন্তা করে দেখা যাক।

পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেই নারী পুরুষের চেয়ে কম আগ্রাসী। শিশু অবস্থা থেকেই ব্যবহারের এই তফাত বেশ চোখে পড়ে। ছোট ছেলেরা মারামারি করে বেশি, মৌখিক ঝগড়াতেও তারা মেয়েদের হারিয়ে দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু কিছু পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের এই প্রভেদ মুছে যায় ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি বেশ বজায় থাকে। এই আগ্রাস সমাজে শুধু ক্ষতি করে না, এই আগ্রাসের দৌলতে পুরুষ নানা সৃজনমূলক ও বিপজ্জনক কাজও করতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্য সহজাত কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের সমাজে পুরুষভূমিকার সঙ্গে আগ্রাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা ছোট ছেলেদের বলি 'কেঁদে বাড়ি আসবি না দু ঘা দিয়ে তবে আয়।' শান্তিপ্রিয় পুরুষদের আমরা 'মেয়েলি' বলি, কখনো কখনো তাদের শাঁখা সিঁদুর পাঠিয়ে অপমান করি। আসল কথা সমাজে পুরুষের আগ্রাসী ব্যবহারকে আমরা উৎসাহ দিই। মেয়েদের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উল্টো। মারপিট করে এলে আমরা মেয়েদের শাস্তি দিই, এমনকি তাদের মৌখিক ঝগড়াকেও সমর্থন জানাই না। ধীরে ধীরে মেয়েরা শেখে যে, আগ্রাসী হলে সমাজে তাদের বদনাম হবে, তারা অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় তারা যে শান্তিপ্রিয় হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহ কী ! পুরুষের আগ্রাসী আচরণ সবটাই শেখা কিনা বলা যায় না, তবে শিক্ষার প্রভাব সরিয়ে নিলে নারীর সঙ্গে তার তফাত কতটা থাকবে তা ভাবার বিষয়।

এর পরের বৈশিষ্ট্য হল আত্মনির্ভরশীলতা। পুরুষ আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা, মহিলারা পরনির্ভর, তাদের মধ্যে স্বাধীন মনোবৃত্তি কম। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আবার শিক্ষার প্রসঙ্গ ওঠে। এখানে শুধু বর্তমান সমাজ, মা বাবা বা আত্মীয়-স্বজনের শিক্ষা নয়, এর চেয়েও গভীর শিক্ষা প্রতি সমাজেই রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মেই নারীর আচরণ সম্পর্কে কঠিন নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রিশ্চান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে খুবই স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। সেইন্ট পল বলেছেন ' প্রত্যেক পুরুষের প্রভু খ্রিস্ট, আর প্রত্যেক নারীর প্রভু পুরুষ'। নারী পুরুষের অধীন হবে, তার বশবর্তী হবে – ইহুদি ও মুসলিম ধর্মেও এই একই নির্দেশ। হিন্দু ধর্মও যে এই দল থেকে বাদ পড়ে না, তা মনুসংহিতা পড়লেই বোঝা যায়।

'যে পুরুষ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন, অন্য নারীতে আসক্ত বা যার মধ্যে বিন্দুমাত্র গুণও নেই – তেমন স্বামীকেও ঈশ্বররূপে স্ত্রীর ভক্তি করা উচিত।' (মনু, ৫, ১৫৩)

'শৈশবে নারী পিতার অধীন হবে, যৌবনে স্বামীর, আর স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের।' (মনু, ৫, ৪৮) এই শিক্ষার পর মেয়েরা যে পিতা, ভাই, স্বামী, পুত্র বা এদের অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের ওপর নির্ভর করবে তাতে আর আশ্চর্য কী ! এই নির্ভরশীলতা ও বশ্যতার ওপর সহজাত প্রবৃত্তির ছায়াও নেই।

মেয়েরা ভীতু, এই অপবাদ নারীকে সবসময়ই শুনতে হয়। মহিলাদের মধ্যে আশঙ্কা বেশি, সাহস কম, অন্তত সমাজের তাই ধারণা। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যখন মেয়ে এবং ছেলেদের নিজেদের ভয় ও আশঙ্কা সম্বন্ধে বলতে দেওয়া হয় (self report) তখন সত্যিই মেয়েরা অনেক বেশি ভয় ও আশঙ্কার কথা বলে। কিন্তু পরীক্ষকেরা যখন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করেছেন, তখন তাঁরা তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো তফাতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেননি। অর্থাৎ বাইরের পর্যবেক্ষক ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভয় পাওয়া বা আশঙ্কার বিশেষ কোন পার্থক্যই খুঁজে পান না। এর কারণ কী হতে পারে ? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, এর কারণ সমাজে ছেলেদের ভয় পাওয়াটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই নিজেদের সম্বন্ধে বলতে হলে ছেলেরা তাদের মনের ভয় বা আশঙ্কার কথা বেশি প্রকাশ করে না। কিন্তু মেয়েরা ভয় পেলে সমাজে বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি অনেকক্ষেত্রে এটি তাদের নারীত্বের প্রতীক। তাই তারা নির্দ্বিধায় বা অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে মনের ভয় ও আশঙ্কা প্রকাশ করে। এরই ফলে স্বউক্ত বিবরণে নারী ও পুরুষের ভীতিবোধের মধ্যে আমরা এত বিশাল প্রভেদ দেখতে পাই। কিন্তু যখন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মহিলা ও পুরুষদের তাদের অজান্তে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিরীক্ষণ করেন তখন এই প্রভেদ আর চোখে পড়ে না।

অনেকের মতে আর একটি বৈশিষ্ট্যে নারী ও পুরুষের পার্থক্য লক্ষণীয়। সে হল সহানুভূতিশীলতা। তারা নিজেদের মনে দিয়ে অন্যের পরিস্থিতি বুঝতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে। আবার এরই সঙ্গে দেখা যায় যে, ছেলেরা দুঃস্থকে সাহায্য করে বেশি। মেয়েদের মন যদি এত নরমই হয় তাহলে তাদের মধ্যে সক্রিয় সাহায্যের ইচ্ছা এত কম কেন ? এর প্রধান কারণ হল সমাজে মেয়েদের ক্ষমতাহীন অবস্থা। তারা স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় অন্যকে সাহায্য করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করার আগে তাকে তার অভিভাবকদের অনুমতি চাইতে হয়, নয়তো সমাজের কাছে তার তিরস্কার পাওনা থাকে। এই অবস্থায় শুধু মনে মনে সমবেদনা জানানো ছাড়া সে আর কীই-বা করতে পারে ?

এগুলি ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্যেও নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি চঞ্চল, সক্রিয় ও দুষ্টু, একথা প্রত্যেক দেশের মা বাবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। শিশু অবস্থা থেকেই ছেলেরা বেশি দাপাদাপি করে, একথা সবাই জানে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কিছু কিছু পরীক্ষায় দেখা যায় মেয়েরা বেশি সক্রিয়, আর কিছু কিছুতে ছেলেরা। তবে এটা হয়তো ঠিকই যে, ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই হাত পা নাড়ে বেশি। একেবারে শিশু অবস্থায় মেয়েরা বেশি চটপটে আর সজাগ হয়, কিন্তু বড় হতে হতে তাদের সক্রিয়তা কমতে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন পুরুষ ও নারীর সক্রিয়তার এই স্বাভাবিক পার্থক্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি কারণে বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে নারীর ভূমিকা তাকে ধীরস্থির হতে বাধ্য করে। আমরা ছোট ছেলেদের চঞ্চল, দুষ্টু ও দামাল হতে উৎসাহ দিই, কিন্তু মেয়েদের বেলায় চাই তারা লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকুক। এমনকি আমরা ছেলেদের খেলনা কিনে দিই বল, ব্যাট, মোটরগাড়ি, যা নিয়ে খেলতে গেলে একজায়গায় বসে থাকা অসম্ভব। কিন্তু মেয়েদের দিই পুতুল, রান্নাবাটি, যা শুধু ভবিষ্যতের মহড়া নয়, তাদের একজায়গায় স্থায়ী হতেও শেখায়। ফলে শিশু অবস্থার সামান্য তফাত বড় হতে হতে খুবই গভীর পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েরা সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাদের স্বকীয়তা কম, এটিও একটি প্রচলিত বিশ্বাস। এখনও পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণে এ বিশ্বাস সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বটে, কিন্তু সমাজ থেকে এই বিশ্বাস মিলিয়ে যাবার কোনো লক্ষণই নেই। শিশু অবস্থায় ছেলে ও মেয়েরা একইরকমভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তবে বড় হতে হতে কিছু তফাত চোখে পড়ে। এর একটি কারণ ছেলেদের বিদ্রোহ বা স্বাধীন আচার সমাজ সহজেই সহ্য করে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় এই ব্যবহার অত্যন্ত কঠিনভাবে দমন করা হয়। কিশোর কিশোরীদের মধ্যে চলতি ফ্যাশন, গান ইত্যাদি একইরকমভাবে জনপ্রিয় হয়। অর্থাৎ দু দলই প্রভাবান্বিত হয় একইরকমভাবে। বরং কিশোর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি দল গঠন করে, ফলে এইসব দলের নিয়ম মেনে চলার ঝোঁক তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা নিশ্চয়ই পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি অন্যের মন যুগিয়ে চলেন, কিন্তু সেটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কিনা সন্দেহ। নারীর সামাজিক ভূমিকার দাবিই নারীকে সংসারে অন্যের মন যুগিয়ে চলতে বাধ্য করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগ্রাসী ব্যবহার, আত্মনির্ভরশীলতা, ভীতি ও আশঙ্কাবোধ, সমব্যথা, সক্রিয়তা ও স্বকীয়তা, সবগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ বেশি নয়। যেটুকু প্রভেদ আমরা দেখি তার কিছুটা সহজাত হলেও বেশিরভাগটাই শিক্ষাগত। সমাজ নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট ভূমিকা আলাদা করে দিয়ে সেই সংজ্ঞা অনুসারে ব্যবহার আমাদের শিখিয়ে চলেছে। এই শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় ভবিষ্যতে নারী ও পুরুষের আচরণের বেশিরভাগ পার্থক্য মিলিয়ে যাবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নারী পুরুষ হিসেবে প্রভেদের রেখা আর তত উল্লেখযোগ্য থাকবে কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতের সমাজে কাজকর্মের ভাগ হবে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা অনুযায়ী। নারী পুরুষের গোষ্ঠীপ্রভেদ সেখানে অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে।

ওজন কমাবার সহজ উপায় (২)

ডাঃ কল্যাণ মুখার্জি

ওজন কমাতে গেলে কি কি করতে হবে? কয়েকটি রচনায় ডাঃ কল্যাণ মুখার্জি তাই-ই বোঝাবার চেষ্টা করছেন। প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল সংখ্যায়। এবারে দ্বিতীয় কিস্তি।

বড়দের ওজন, চার্ট দেখে বোঝা যেতে পারে কিন্তু শিশুদের ওজন ঠিক আছে কিনা কি করে বুঝব? টুকু গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে।

জন্মের পর এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ওজন যে হারে বাড়ে তা জীবনের আর কোনো সময়ই হয় না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৫-৮ আউন্স বেড়ে ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যে শিশুটির ওজন হয় জন্ম-ওজনের দ্বিগুণ। এর পর বৃদ্ধির গতি একটু কমে যায়। এক বছরে হয় প্রায় তিনগুণ। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে একটি নবজাতক যতটা লম্বা থাকে এক বছরে হয় তার দেড়গুণ। অর্থাৎ যদি কোনো নবজাতকের জন্ম-ওজন হয় ৫ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্য যদি হয় ১৮ ইঞ্চি তবে এক বছর বয়সে তার ওজন হওয়া উচিত ১৫ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত ২৭ ইঞ্চি। শিশুদের ওজন ও উচ্চতার চার্টও আছে। তাই সেটি দেওয়া হল তোমার প্রশ্নের উত্তরটা সম্পূর্ণ করার জন্য। (সারণি – ১)

গ্রামের মায়েদের পক্ষে ওজন মাপার যন্ত্র পাওয়া এত সোজা নয়। তাহলে তাদের পক্ষে শিশুদের ওজন ঠিক আছে কিনা জানার উপায় কি? মিঠু, টুকুর প্রশ্নটা জটিল করার চেষ্টা করে।

গ্রামের মায়েরা একটু চেষ্টা করলেই একটা ফিতে জোগাড় করতে পারেন। এবং ফিতে দিয়ে শিশুটির বাহুর ঘের মাপলেই সহজেই বোঝা যাবে শিশুটির ওজন মোটামুটিভাবে ঠিক আছে কিনা। নবজাতক শিশুর বাহুর ঘের হয় প্রায় ৪ ইঞ্চি বা ১০.৫ সেন্টিমিটার। ১ বছর বাদে এই ঘেরের মাপটি বেড়ে হয় ১৬ সেন্টিমিটার বা ৬ ইঞ্চি।

১ বছর বয়সের পর এই মাপ ৫ বছর পর্যন্ত একই থাকে। অর্থাৎ ১ থেকে ৫ বছরে শিশুদের বাহুর ঘের যদি ৬ ইঞ্চি বা ১৬ সেন্টিমিটার হয় তবে বুঝতে হবে যে শিশুটির ওজন মোটামুটিভাবে ঠিকই আছে। যদিও পাশের বাড়ির রাঙা পিসির চোখে খোকাকে খুবই রোগা দেখাতে পারে।

বেশিরভাগ মা-ই তাঁদের শিশুদের ওজন নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাঁদের কাছে খোকাকে সব সময়ই রোগা লাগে। প্রায়ই দেখা যায় মা হন্তদন্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ তাঁর মতে তাঁর শিশুটির ওজন কম। অথচ ওজন নিয়ে দেখা গেছে যে শিশুটির ওজন ঠিকই আছে। আসল ব্যাপারটা হল আমাদের মায়েরা শিশুপালনের জন্য কোনো বই-ই পড়তে রাজি নন। তাঁদের জ্ঞান বেশিরভাগ সময়ই মাসি পিসিদের ওপর নির্ভরশীল। টুকু, তুমি যদি একটু কষ্ট করে খোঁজ নাও তবে দেখবে যে যাদের বাড়িতে রবীন্দ্র সমগ্র এবং শরৎ সাহিত্য সমগ্র সযত্নে সাজানো আছে তাদের বাড়িতেই শিশুদের দেখভাল করার জন্য কোনো কেতাবই নেই। 'Planning for motherhood' বা মা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে। ফলে শিশুকাল থেকে আমাদের বাচ্চারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন, যদি শিশুদের ওজন বেশি থাকে তাহলে পরবর্তীকালে তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি, বহুমূত্র, এবং হৃদযন্ত্রের রোগ বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া Bow legs বা বেঁকা পা এবং flat fat অস্বাভাবিক মোটা শিশুদেরই বেশি হয়।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পাঁচমাস বয়স পর্যন্ত শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য হল মায়ের দুধ। শিশুদের হজম শক্তি অপরিণত থাকে তাই মায়ের দুধের উপাদান তার প্রয়োজনের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। অর্থাৎ মায়ের দুধের বিকল্প নেই।

(১) মায়ের দুধের প্রোটিন গরুর দুধের চেয়ে কম। হজম করাও সহজ। মায়ের দুধের প্রোটিন (আমিষ) শিশুর দেহের প্রোটিনের সমধর্মী হওয়ায় শিশুটি সহজেই তা হজম করতে পারে।

(২) মায়ের দুধের প্রোটিনে এক ধরনের জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়। তাই মায়ের দুধ শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মায়ের দুধের দ্বারা লালিত শিশুর সুস্থ এবং সবল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

(৩) মায়ের দুধে এমন কিছু এনজাইম থাকে যা গরুর দুধে পাওয়া গেলেও খুবই কম।

(৪) লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয়



যে-কোনো জিনিসের ঘেরের মাপ নিতে হলে ফিতের দুদিক যেখানে মিলেছে সেই দূরত্বটা মাপতে হবে।



হাতের ঘেরের মাপ নেওয়া হচ্ছে

আজকাল এক টাকায় আপনি কিই বা কিনতে পারেন !

ভেবে দেখুন! দিনে এক টাকারও কম্ খরচ করে আপনি আপনার পরিবারের জন্যে সুরক্ষা আর শান্তি কিনতে পারেন, নিউ ইণ্ডিয়ার ডোমেস্টিক ইন্সিওরেন্স প্যাকেজ স্কীমের সাহায্যে!

১. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার বীমা
২. হাসপাতালের চিকিৎসা পলিসি
৩. আগুন ও চুরির বীমা
৪. বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল বীমা
৫. টি.ভি. সেট বিকল বীমা
৬. পেড্‌ল্ সাইকেলের বীমা
৭. ভ্রমণকালে মালপত্রের ক্ষতির বীমা
৮. ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের বীমা

আজকের দিনে, এক টাকায় আপনি হয়তো আধখানা আইসক্রীম, আধ বোতল সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক বা তিনটে চারটে সিগারেট কিনতে পারেন। তবে তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

কিন্তু এই এক টাকা দিয়েই আপনি আপনার ঘরসংসারকে এমন সব দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে পারেন—যা থেকে আপনার ভয়ঙ্কর আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

দিনে মাত্র এক টাকারও কম খরচ করে আমাদের ডোমেষ্টিক ইন্সিওরেন্স প্যাকেজ স্কীমের সাহায্যে আপনার পরিবারকে ৮ রকমের দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করুন!

এই প্যাকেজ স্কীম, আপনাকে আপনার সব রকমের প্রয়োজনের উপযোগী সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

রোজ আপনার বাচ্চার আইসক্রীমের জন্যে যা খরচ করেন, তার চেয়ে কম দিয়ে আপনি আপনার পরিবারের জন্যে কত বেশী সুরক্ষা পেতে পারেন!

আপনার কাছের নিউ ইণ্ডিয়া অফিসে আসুন বা চিঠি লিখুন। আপনাকে বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমরা সদাপ্রস্তুত!

NEW INDIA ASSURANCE
A subsidiary of the General Insurance Corpn. of India.

নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স
কত কম দিয়ে…
কত বেশী সুরক্ষা!



Contour Ads-NIA-960C/83 Ben

খনিজ পদার্থগুলি মায়ের দুধে বেশি থাকে।

(৫) গরুর দুধের ভিটামিন বি ও সি ফোটানোর সময় কিছুটা নষ্ট হয়, মায়ের দুধে সে আশঙ্কা থাকে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আগেকার লেঠেলরা লড়াই-এর সময় যে হুঙ্কার দিত 'দেখি বেটা তুই কত তোর মায়ের দুধ খেয়েছিস' কথাটা নিছক অসার নয়।

শিশুকে স্তন্যদান করাতে আজকাল অনেক মাতাই চান না। কারণ তাদের ধারণা স্তন্যদান করলে বুকের 'শেপ' বা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বুকের সৌন্দর্য নষ্ট হয় ঘন ঘন গর্ভধারণে ও অপুষ্টিতে। বরং স্তন্যদানে জরায়ু (uterus) তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, শিশুটির পুষ্টি সাধন করে এবং সংক্রামক ব্যাধি থেকে তার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। তা ছাড়া স্তন্যদানের মধ্যে দিয়ে মা এবং শিশুর মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অনেক ক্ষেত্রে মায়ের দুধে শিশুর পেট ভরে না, বা মায়ের অসুস্থতার জন্য শিশুটিকে মায়ের দুধ দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে গরুর দুধ বা নির্ভরযোগ্য গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে গরুর দুধকে যথাসম্ভব মায়ের দুধের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি আউন্সে মায়ের ও গরুর দুধের ক্যালরির পরিমাণ সমান – প্রায় ২০ ক্যালরি।

প্রথম ৪-৫ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর দরকার প্রতি পাউন্ড ওজনের জন্য ৪০ থেকে ৫০ ক্যালরি। অর্থাৎ যে শিশুর ওজন ১০ পাউন্ড তাকে দিতে হবে সারাদিনে ১০×৫০= ৫০০ ক্যালরি। ১ আউন্স দুধে থাকে ২০ ক্যালরি। তাই যে শিশুর ওজন ১০ পাউন্ড তাকে দিনে ৫০০ ÷ ২০ = ২৫ আউন্স দুধ দেওয়া উচিত। বুকের দুধ দেওয়ার সময় পরিমাণ মাপা অসম্ভব তাই শিশুটি খেতে চাইলেই খাওয়ানো উচিত (Demand feeding)। হিসেবী মায়েরা সময় দেখে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন তাদের শিশুরা কতখানি দুধ খেয়েছে। ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে বা টেলিভিশন দেখতে দেখতে

সারণি – ১

শিশুর ন্যূনতম ওজন ও উচ্চতা কী হওয়া উচিত

বয়স	ওজন (পাউন্ড)	উচ্চতা (ইঞ্চি)
জন্ম	৬ "	২০ "
৩ মাস	১০ "	২১ "
৬ মাস	১৪ "	২৩.৫ "
৯ মাস	১৭ "	২৫.৮ "
১ বছর	২০ "	২৭. ৬"
২ বছর	২৫ "	৩০.৪ "
৩ বছর	৩০ "	৩৩.৮ "
৪ বছর	৩৪ "	৩৫.২ "
৫ বছর	৩৮ "	৩৮.৩ "

শিশুটিকে বুকের দুধ দেওয়া যেতে পারে যদি ঘড়ির দিকে নজরটা ঠিক রাখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে যদি কোনো শিশুর ওজন গড় ওজনের কমও থাকে তা হলেও তাকে সেই বয়সে যা ওজন হওয়া উচিত সেই পরিমাণেই খেতে দিতে হবে সারাদিনে। অবশ্য ঠিক পরিমাণ খাদ্য পেয়েও যদি শিশুটির ওজন স্বাভাবিক হারে না বাড়ে, তাহলে শিশুটিকে একজন সুচিকিৎসক দেখানো একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ শিশুদের ক্ষেত্রে ঠিক মত ওজন না বাড়া এবং অত্যধিক ওজন দুটোই সমান বিপজ্জনক।

বাজারে আজকাল হাজার রকমের গুঁড়ো দুধ পাওয়া যায়। তাদের নামও হরেক রকমের। তাই মায়েরা একটু গুলিয়ে ফেলতেই পারে। টুকু একটু রাগের সঙ্গেই বলে বসে।

যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা যায়, তবে মুশকিলে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। গরুর দুধের উপাদান হল চার প্রকারঃ

আমিষ (Protein) শতকরা ৪ ভাগ

স্নেহজাতীয় (fat) শতকরা ৪ ভাগ

শর্করা (Carbohydrate) শতকরা ৪ ভাগ

জল – শতকরা ৮৮ ভাগ।

(১) যখন গরুর দুধে সবকটি উপাদান এক সঙ্গে থাকে, তখন তাকে বলা হয় Whole milk বা Full Cream milk.

(২) যখন স্নেহ জাতীয় বা fat দুধ থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন দুধের নাম হয় Skim milk বা মাখন ছাড়া দুধ বা সরতোলা দুধ।

(৩) যখন জল সম্পূর্ণ ভাবে দুধ থেকে বাদ দেওয়া হয় তখন দুধের নাম হয় dried milk বা গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধ আবার দুপ্রকার হতে পারে।

১। Full cream dried milk powder অর্থাৎ গুঁড়ো দুধ স্নেহজাতীয় পদার্থ সহ।

২। dried skim millk powder অর্থাৎ স্নেহজাতীয় পদার্থ ছাড়া গুঁড়ো দুধ।

অনেকে, যারা হৃদযন্ত্রের রোগে ভোগেন তাদের স্নেহজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ fat খাওয়া উচিত নয়। তাই তারা যদি গুঁড়া দুধ খেতে চান তবে dried skim milk powder অর্থাৎ স্নেহজাতীয় পদার্থ ছাড়া গুঁড়ো দুধই কিনবেন। গুঁড়ো দুধ কিনে শিশুটিকে খাওয়ানো হচ্ছে এ কথা বলার কোনো মানে হয় না। শিশুদের full Cream dried milk powder অর্থাৎ স্নেহ জাতীয় পদার্থসহ গুঁড়ো দুধ জল

সারণি – ২

গরুর দুধে জল মেশানোর হিসাব

৩ আউন্স	দুধ ২ আঃ + জল ১ আঃ + চিনি ১ চামচ
৪ আউন্স	দুধ ৩ আঃ + জল ১ আঃ + চিনি ১ চামচ
৫ আউন্স	দুধ ৪ আঃ + জল ১ আঃ + চিনি ১ চামচ
৬ আউন্স	দুধ ৫ আঃ + জল ১ আঃ + চিনি ১ চামচ

মিশিয়ে খাওয়ানোই উচিত।

গরুর দুধে জল মিশিয়ে মায়ের দুধের সমপর্যায় আনা চলে। কিভাবে তা করা হয় তা দেওয়া হল। (সারণি – ২)

নিজেদের খেয়ালখুশি মত গুঁড়ো দুধ কম দিয়ে বেশি জল মিশিয়ে পাতলা দুধ খাওয়ানোর অর্থ শিশুটিকে অপুষ্টিতে ভুগতে বাধ্য করা। স্বভাবতই সে শিশুর ওজন বাড়বে না। তিনমাস বয়স থেকেই শিশুটিকে একটু একটু ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দিন ১ চামচ এবং পরে দেখেশুনে পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। ফলের রসে ভিটামিন সি থাকে। শিশুদের কাছে এর প্রয়োজন অনেক।

২ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের সব থেকে বড় চাহিদা হল প্রোটিনের বা আমিষ জাতীয় খাদ্যের। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, পনির (cheese) প্রতিটি খাদ্যই শিশুদের দিতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত পুষ্টিবিদই বলেন, ২ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের প্রোটিন বা আমিষ দেওয়া উচিত শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ। এই সময় শিশুটির দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়ে উঠতে থাকে দুর্বার গতিতে। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য জোগায় বা Building units ইমারত এর ইট।

১-৪ বছর বয়সের খাদ্য প্রোটিন (আমিষ) – ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম, ফ্যাট (স্নেহজাতীয়) – ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম, কারবোহাইড্রেট (শর্করা)– ৭৫ থেকে ৮৫ গ্রাম।

জাপানে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ঠিক মত প্রোটিন যুক্ত খাদ্য দেওয়ার ফলে শিশুদের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে planned motherhood বা মা হওয়ার প্রস্তুতির কতখানি প্রয়োজন। আমার মতে মা-রাই জাতির ভবিষ্যৎ। কারণ তারাই চার্চিল, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রদের গর্ভে ধারণ করেন। ও পরে লালন-পালন করেন। লালন-পালনেতেই ফারাক আমাদের দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার। সুস্থ সবল শিশু পেতে হলে সুস্থ সবল মাতার একান্ত প্রয়োজন।

পরবর্তী বিষয় ঃ বড়দের ক্যালরি ও খাদ্য

গোদরেজ হেয়ার ডাই

নিমেষের মধ্যে আপনাকে কম বয়সী দেখানোর এক সহজ উপায়



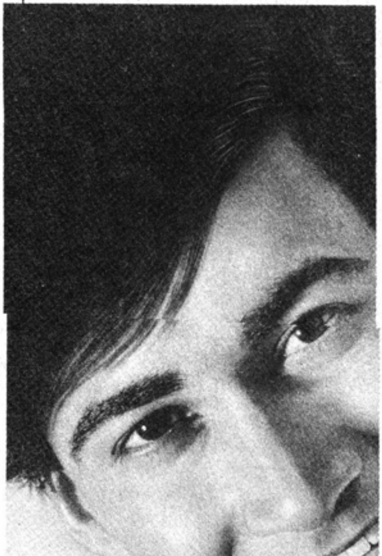
নিমেষের মধ্যেই যদি অনেক কম বয়সী আর অনেক বেশী সুন্দর দেখাতে পারা সম্ভব হয়, তাহলে আর বয়সের জন্যে চিন্তা ভাবনা কেন ?

গোদরেজ আপনাদের জন্যে এনেছে এই আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়া একমাত্র হেয়ার ডাই। না মাখামাখি, না হাঁকাহাঁকি, না ঝামেলা-ঝক্কি, এই গোদরেজ আপনা থেকে চুলের একেবারে গোড়া পর্যান্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আপনার পছন্দমতটি বেছে নেবার জন্যে পাবেন, স্বাভাবিক কালো ও গাঢ় খয়েরী রঙে, যা দিয়ে আপনার চুল হয়ে উঠবে তারুণ্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক সুন্দর। আর, এর অপরূপ সুগন্ধিত কণ্ডিশনার আপনার চুলকে ক'রে তুলবে সুরভিত ও স্বাভাবিক দোলদোলানো।

Godrej
পার্মানেন্ট
লিকুইড হেয়ার ডাই

"How Godrej takes away your worries from hair dyeing" **বিনামূল্যে** এই পুস্তিকার জন্যে DEPT:CPD/SU তে নীচের ঠিকানায় লিখুন—





ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর হেয়ার ডাই!

গোদরেজ সোপস্ লিমিটেড, কনজিউমার প্রডাক্টস্ ডিভিশন, ইস্টার্ণ এক্সপ্রেস্ হাইওয়ে, ভিক্রোলি বম্বে-৪০০ ০৭৯

CLARION/21/244 BEN

আইসক্রিম

আইসক্রিম হল এমনই এক লোভনীয় জিনিস যার জন্য – 'I, you and we all scream'. সত্যিই আইসক্রিম আমাদের সব সময়ের প্রিয় জিনিস। বেশিরভাগ সময়ই আমরা দোকানের তৈরি আইসক্রিম খেয়ে সাধ মেটাই, অথচ বাড়িতে আইসক্রিম তৈরি করে দোকানের স্বাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কিন্তু কঠিন কাজ নয়।

তবে আইসক্রিম তৈরি করার সময় কতকগুলো জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যেমন আইসক্রিম রেফ্রিজারেটরে ঢোকানোর আগে আপনার ফ্রিজার কম্পার্টমেন্টের তাপাঙ্ক সর্বোচ্চ করে দিতে হবে, আপনি যে ট্রে-তে আইসক্রিম ঢালবেন তা সরাসরি ডিপ ফ্রিজারে রাখবেন, অন্য কিছুর উপর ট্রে বসাবেন না। আইসক্রিম তৈরি করার সময় আইসক্রিম চার্নার ব্যবহার করবেন, এবং সবশেষে কথা হল যে, দুধ কখনও বেশি ফোটাবেন না, তাতে এর স্বাদ অন্যরকম হয়ে যায়।



চকোলেট আইসক্রিম

চকোলেট আইসক্রিম ঃ ৩ লিটার দুধ, ৬ চা চামচ কোকো, ৪ চা চামচ চকোলেট পাউডার, ৩ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ২২৫ গ্রাম টাটকা ক্রিম (এই ক্রিম নিউ মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। খোলা অথবা টিনজাত দুরকমই পেতে পারেন), ৬ চা চামচ কাস্টার্ড পাউডার (মাথা ঝাড়া), ২ চায়ের কাপ চিনি।

প্রথমে কোকো, চকোলেট পাউডার ও কাস্টার্ড পাউডার ১ কাপ ঠাণ্ডা দুধে গুলে নিন, বাকি দুধে চিনি মিশিয়ে উনুনে বসান। যখন দুধ ফুটে উঠবে তখন এই চকোলেটের মিশ্রণ ধীরে ধীরে দুধে ঢালতে থাকুন এবং একটা বড় চামচ দিয়ে সমানে নাড়বেন প্রায় ৪ মিনিট মত। এবার নামিয়ে ঠাণ্ডা করে এতে ভ্যানিলা ও ক্রিম মিশিয়ে দিন। একটা আইসক্রিম চার্নারে মিশ্রণটি চার্ন করে আইস-ট্রেতে ঢেলে ডিপ ফ্রিজে দিয়ে দিন। ৪০-৪৫ মিনিট পর বার করে দেখে নিন আইসক্রিম তৈরি হয়ে গেছে কিনা।

ভ্যানিলা আইসক্রিম ঃ ২ কাপ চিনি, একের চার কাপ কর্নস্টার্চ (Cornstarch), একের চার চা চামচ নুন, ৪ কাপ দুধ, ৪টি ডিম (ফেটানো), ২ টেবল চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ৪ কাপ ক্রিম।

উনুনের উপর একটি বড় পাত্রে জল বসান। জল বেশ গরম হলে তার ভিতরে আর একটি পাত্র বসাতে হবে। এই পাত্রে চিনি, কর্নস্টার্চ ও নুন একসঙ্গে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। ২-৩ মিনিট নাড়বার পর ধীরে ধীরে এতে দুধ ঢেলে দিন এবং ১৫ মিনিট মত জ্বাল দিন। যখন দেখবেন বেশ ঘন হয়ে এসেছে তখন এতে ফেটানো ডিম দিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট এই গরম জলের পাত্রের উপর একইভাবে রান্না করুন। মিশ্রণটি ঘন হলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ভ্যানিলা ও ক্রিম মেশান, আইস-ট্রেতে ঢেলে রেফ্রিজারেটরে দিয়ে দিন।

কফি আইসক্রিম ঃ ১ কাপ দুধ, একের চার কাপ ইনস্ট্যান্ট কফিগুঁড়ো, ৩টি ডিমের হলুদ অংশ, একের চার চা চামচ নুন, ১ কাপ চিনি, ৩ কাপ টাটকা ক্রিম।

একটি প্যানে কফি ও দুধ মিশিয়ে উনুনে গরম করুন। সামান্য গরম হলে নামিয়ে আধ কাপ চিনি মেশান এবং ৫ মিনিট পর এতে ডিমের হলুদ অংশটি হালকা করে ফেটিয়ে দিয়ে দিন। অবশিষ্ট চিনি, নুন ও ১ কাপ ক্রিম দুধ, কফি ও ডিমের মিশ্রণে ঢেলে ভালোভাবে মিশিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। বাকি ২ কাপ ক্রিম শেষে মিশিয়ে আইসক্রিম বসিয়ে দিন।

ম্যাঙ্গো আইসক্রিম ঃ ১০টি পাকা আম, ২ কাপ চিনি, ১০ কাপ দুধ।

প্রথমে দুটি আমের খোসা ছাড়িয়ে তাকে কুচি কুচি করে কেটে রেখে দিন। এবার বাকি আমগুলো থেকে সমস্ত রস বার করে নিন, আমের রসে চিনি মেশান। দুধ প্যানে দিয়ে ১০ মিনিট মত জ্বাল দেবার পর নামিয়ে ঠাণ্ডা করে তাতে আমের রস ও কুচোনো আম দিয়ে দিন। আইসক্রিম চার্নারে দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। মেশানো হলে ডিপ ফ্রিজে দিয়ে আইসক্রিম জমিয়ে নিন।

সুস্মিতা সরকার



ভ্যানিলা আইসক্রিম

আমেরিকায়

সংসার দেখার দায়িত্ব কি শুধু মহিলাদের?

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল, যখন আমেরিকান মহিলারা সারাদিন বাড়িঘর সাজানো, পরিষ্কার রাখার কাজে বেশ আগ্রহ পেতেন। প্রতিটি আলোর বাল্ব নিজে হাতে মুছতেন। তাঁদের ঘরের মেঝেতে সাবান, জল, মোমপালিশ দেবার পর মুখ দেখা যেত আয়নার মতো। কিন্তু ক্রমশ অনেকের এই আগ্রহে ভাটা পড়ছে। দিনরাত ধোওয়া, মোছা নিয়ে কাটাতে তাঁরা রাজি নন। এদেশের ৬৮% মহিলাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন – আগের মতো নিখুঁত পারিপাট্যের সময় নেই। মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে বাড়ি পরিষ্কার রাখার অতিরিক্ত কিছু আর তাঁরা করতে চাইছেন না। এর প্রধান কারণ মহিলাদের বাইরের কর্মজীবন।

সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে তাদের আইনজীবী মা নিজের পেশায় চলে যান। সপ্তাহে একদিন পাঁচ ঘণ্টার জন্য ভাড়া-করা কৃষ্ণাঙ্গী বা ভিয়েতনামী পরিচারিকা আসেন বটে, তবে অত খুঁটিয়ে পরিষ্কার করার তাঁর সময় থাকে না। কর্মজীবনে ব্যস্ত মহিলারা মনে করেন – বাড়ির কাজ বেশি নিপুণভাবে করা মানেই সময় নষ্ট, অকারণ কর্মক্ষমতার অপচয়। এক মহিলা বিবাহবিচ্ছেদের পর আক্ষেপ করে বললেন – বোকার মতো চোদ্দ বছর ধরে রোজ রোজ তোয়ালে কেচে ইস্ত্রি করেছি। সারা বাড়ির আয়না চকচকে করেছি। আলমারিতে বরের স্যুটের সঙ্গে রং মিলিয়ে মিলিয়ে টাই সাজিয়েছি। ছেলেমেয়েরা হোঁচট খাবে এই ভয়ে ড্রাইভ ওয়ে থেকে ছোট নুড়িটুকু পর্যন্ত সরিয়ে রাখতাম। এখন সে সব দিনের বোকামোর কথা ভেবে নিজের ওপর রাগ হয়। ডিভোর্সের পর নিজে একটা ব্যবসা করছি। বাইরের কাজে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ। বাড়ি পরিষ্কার করতে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয়, সংসার সামলানোর জন্যে একজন স্বামী থাকলে বরং সুবিধে হত।

সংসারে স্বামীদের কাজ করা নিয়েও নানা সমস্যা। আমি দেশে থাকাকালীন মনে করতাম – বিলেত, আমেরিকার স্বামীরা বুঝি ঘর গৃহস্থালির কাজে খুব সাহায্য করেন। আমেরিকায় আসার পর লক্ষ করলাম অধিকাংশ আমেরিকান স্বামীই এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন। স্ত্রী চাকরি না করলে, মোটামুটি বাড়ির কাজ তিনিই করেন। দুজনে চাকরি করলে অবশ্য স্বামীকে কিছু সাহায্য করতেই হয়। কিন্তু তাঁদের অর্ধেক কাজই স্ত্রীদের মনোমত হয় না। এর ওপর আছে অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলার কাজগুলো বেছে নেবার চেষ্টা। রান্নাঘরে স্যালাড বানানো, ওভেনে কিছু বেক করতে দেওয়া, বাচ্চাকে নিয়ে একসঙ্গে চান করা, তাকে নিয়ে বসে বসে টেলিভিশন দেখা বা বই পড়া, একটু বাজার করে আনা – এসবই স্বামীদের পছন্দসই কাজ। ওদিকে স্ত্রী সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভ্যাকিউমক্লিনার চালাচ্ছেন, হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে মুছছেন, ওয়াশিং মেশিনে গাদা গাদা কাপড় কাচছেন। ইস্ত্রির পর্ব তো আছেই। বাথরুমের আনাচ কানাচ ধোওয়া মোছা, সময় সাপেক্ষ রান্নাগুলি করা, বাসন মাজা – এসবই তাঁর কাজ। স্ত্রীরা শ্রান্ত এবং বিরক্ত হলে স্বামীরা বলছেন – এত সাহায্য করি, তবু মন পাই না।' অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।

পুরনো পন্থীরা ভাবছেন, নারীমুক্তির হাওয়া লেগে সাংসারিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম বিদায় নিতে বসেছে। দু-তিন দশক আগে পর্যন্ত পুরুষের কাছে বাড়িই ছিল সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জায়গা। তখন পুরুষ উপার্জনের দায়িত্ব নিতেন, স্ত্রী সংসারের। মনে করতেন একে অন্যের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন। এখন আর সে যুগ নেই। দুজনেই বাইরের কাজে যোগ দিয়েছেন। স্ত্রীর ক্ষেত্রে সম অধিকারে বাঁচার ইচ্ছেয় এবং যথার্থভাবে আর্থিক প্রয়োজনেও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংসারের দায়িত্ব শুধু তাঁর একার থাকবে – এ মনোভাব বদলের সময় এসেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশ লাভবান হয়ে উঠছে। নিউইয়র্কের একটি রিসার্চ কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে – গত দশ বছরের তুলনায় যদিও এ বছরে সাবান, সোডা, ব্লিচিং পাউডার, মেঝে ঘষার মোম পালিশ, বাসন পালিশ করার সলিউশন ইত্যাদির বিক্রি অপেক্ষাকৃত কমে গেছে (অর্থাৎ অতিরিক্ত ধোয়া মোছার প্রবণতা লোপ পাচ্ছে), কিন্তু ভীষণভাবে বিক্রি হয়েছে কাগজের খাবারের প্লেট, গেলাস, কাপ, প্লাস্টিকের চামচ, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের বেকিংয়ের পাত্র (যা পরে ফেলে দেওয়া যায়) ইত্যাদি। বাথরুমে নিয়মিত কমোড ঝকঝকে রাখার জন্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এক দীর্ঘস্থায়ী সলিউশন। লম্বা বুরুশ দিয়ে ঘষা ঘষির দরকার নেই। ওই সলিউশন দেওয়া থাকলে সব দাগকে প্রতিরোধ করবে। জীবাণুনাশক, সুগন্ধি স্প্রের বিক্রিও খুব বেশি হচ্ছে। সংসারের কাজে সময় বাঁচানোর জন্য ব্যবসা সংস্থাগুলো নানা পন্থা আবিষ্কার করছে। ওয়াশিং মেশিন থেকে ভেজা কাপড় বার করার সময় সারা বাড়ির লোকেরা নানা মাপের, নানা রঙের মোজাকে জোড়ায় জোড়ায় একত্র করা সময়সাপেক্ষ কাজ। এখন এক ধরনের প্লাস্টিকের কলার দিয়ে তাদের জড়িয়ে দিলে ধোওয়ার ধকল সামলেও তারা জোড়মুক্ত হবে না। অপরিষ্কৃত কুকিং রেঞ্জকে সাময়িকভাবে ঢেকে রাখার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে গোল চাকতির মতো ঢাকা।

Whirlpool কোম্পানির তৈরি নতুন রেফ্রিজারেটরের গায়ে আঙুলের ছাপ পড়লেও ধরা যাচ্ছে না। এমন এক ওয়াশিং মেশিন বানাচ্ছে, যাতে সবরকম কাপড় একবারে কাচা যায়। সিল্ক, সুতি, রঙিন, সাদার বাছাবাছি দরকার হবে না। সহজে কাজ মিটিয়ে ফেলাই এ যুগের ধর্ম। আগামী শতকের সংসারগুলির সুবিধের জন্যে কোম্পানি ভিন্নতর সাজসরঞ্জামের পরিকল্পনা করছে। ড্রইং বোর্ডে আঁকা হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্রের নমুনা – যা নাকি ওয়াশিং মেশিন থেকে রোবটের অর্থাৎ যন্ত্রমানবের হাতের সাহায্যে কাপড় টেনে বার করে করে পাশের ড্রাইং মেশিনে ভরে দেবে এবং শুকিয়ে তুলবে। কোম্পানির পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই রোবট পদ্ধতির সাহায্যে একদিন ডিশওয়াশারে বাসন ধোওয়া, জানলা দরজার ধুলো ময়লা পরিষ্কার সবই সম্ভব হবে। তাদের বক্তব্য – রোবট নাকি দশখানা বাজারের ঠোঙা থেকে জিনিসপত্র বের করে রান্নাঘরের তাকে ও রেফ্রিজারেটরে ভরে ফেলবে। কারণ মানুষের সময় ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

আমেরিকায় এসে বাঙালি মহিলারা সংসার করার ধরনটি শেখেন কিছুটা আমেরিকানদের দেখাদেখি, কিছুটা নিজেদের সুবিধেমত। স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছেয় এবং অজস্র আধুনিক সাজসরঞ্জাম পেয়ে বেশ সোৎসাহে সংসার সাজাতে বসেন। কিন্তু প্রথম প্রথম অ্যাপার্টমেন্টে থাকাকালীন বাড়িঘর, বিশেষত রান্নাঘর, বাথরুম ঝকঝকে না রাখলে বহু ক্ষেত্রে অ্যাপার্টমেন্টের মালিক আপত্তি জানান। হাইরাইজ বিল্ডিংগুলিতে মালিকের সঙ্গে ভাড়াটের কোনো যোগাযোগ থাকে না। সুপার ও মেনটেনেন্সের লোকেরা এমনিতে বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যাবার সময় নোংরা রাখার অভিযোগে ভাড়াটের কাছ থেকে মোটারকম খেসারত আদায় করে নেয়। অর্থাৎ কামারের এক ঘা। প্রথম সংসার করতে আসা এমন অনেক অনভিজ্ঞ বাঙালি বঁধূকেই এজন্যে গুণাগার দিতে হয়েছে। রেফ্রিজারেটরে বরফের চাঙড় অথবা কুকিং রেঞ্জে তেল হলুদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখে সুপার অর্থদণ্ড আদায় করে ছেড়েছে। প্রাইভেট বাড়িওলা হলে আরও জ্বালা। আমেরিকান মালিক গিন্নি বাঙালি ভাড়াটের সঙ্গে আমড়াগাছি করতে এসে দেখে যাবে বেসিনে ছোপ ধরছে কিনা বাথটবে সাবানজলের দাগ পড়ছে কিনা। ফলে সতর্ক থাকতে থাকতে বাঙালি মহিলাদেরও শুরু থেকেই বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। বাড়িতে পার্টি দিলে আমন্ত্রিত বাঙালি মহিলারাই আড় চোখে লক্ষ করে থাকেন, গৃহকর্ত্রীর কুকিং রেঞ্জ, ওভেন, সিঙ্ক ঝকঝক করছে কিনা। এত যে তেল, মশলা দিয়ে পোলাও, কালিয়া রান্না হল তার প্রস্তুতির ছিটেফোঁটাও বুঝতে না দেওয়াই হচ্ছে কায়দা। মনে হবে কোনো নতুন বাড়ির রান্নাঘরে এসেছেন। সেখানে যেন তখনও পর্যন্ত একদিনও রান্না হয়নি। থরে থরে সাজানো পাত্রে যত রকম সুখাদ্য ঢাকা দেওয়া আছে, সব বুঝি এসেছে ম্যাজিকের দৌলতে। আনাজের খোসা, মাংসের চর্বি, হাড়গোড়, মাছের আঁশ, মুড়ো, কানকো, ডিমের খোলা, খালি দুধের বোতল থেকে শুরু করে যা কিছু আবর্জনা, সব তখন বাড়ির বাইরের ময়লা ফেলার পাত্রে চলে গেছে ব্যাগবন্দী অবস্থায়। মাছ তো আগের দিন ভেজে নেন অধিকাংশ মহিলা, যাতে বাঙালির বাড়ি ঢুকেই মেছো গন্ধ না বেরোয়। পার্টির দিনে এয়ার ফ্রেশনারের সুগন্ধে বোঝবারই উপায় নেই এটি রান্নাঘর না ফুলশয্যার ঘর। সেদিন বাথরুমের চেহারাও স্যানিটারি দোকানের বিজ্ঞাপনের মতো।

বাঙালি বাড়িতে এত কাজ কে করেন? স্বামী একা চাকরি করলে স্ত্রীই সাধারণত বাড়িঘর পরিষ্কার

রাঁধেন। তবে বাগানের পরিচর্যা, শীতকালে ড্রাইভ ওয়ের বরফ পরিষ্কার, নিজের বাড়ির নানা সারাই, ঝালাইয়ের কাজে স্বামীরা প্রায় অনেকেই দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। স্ত্রী অসুস্থ থাকলে স্ত্রীর সন্তান সম্ভবা বলা হলে, সন্তানটি নেহাত শিশু থাকলে বাঙালি স্বামীরা আনাড়ি হাতেও যথাসাধ্য সামাল দেন প্রায় প্রত্যেকেই। দুজনে চাকরি করলেও স্ত্রীর ওপর সাংসারিক চাপ যথারীতি বেশি থাকে। তবে স্বামীদের সাহায্য পান অপেক্ষাকৃত বেশি। দুজনের আয়ের অঙ্ক বেশ মোটারকম হলে কেউ কেউ দেশ থেকে কোনো কাজের মহিলাকে স্পনসর করিয়ে আনেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা সকলের ক্ষেত্রে বেশিদিন স্থায়ী হয় না নানা কারণে। প্রথম কিছুদিন বাড়ির যাবতীয় কাজ, রান্নাবান্না, ছেলে মেয়ে দেখাশোনার পরই ভারতীয় পরিচারিকাটি সামাজিক জীবনের অভাবে হাঁপিয়ে ওঠেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন – শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করছেন, তা বাইরের যে কোনো কাজের তুলনায় নেহাতই কম। ফলে অভিযোগ, বাদ-প্রতিবাদ, অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা, দেশে ফেরার দাবি জানানো – নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব কারণে অনেক ভেবেচিন্তে ভারতীয় হাউস কিপার আনাতে হয়। তবে যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের এ ব্যবস্থায় খুব সুবিধে হয়।

বাঙালির সংসারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দুটি চরম দিকই দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দীর্ঘকাল মার্কিন প্রবাসী বাঙালি বাড়িতে গিয়ে দেখেছি ভেলভেটের সোফায় শিশুপুত্রের মূত্রকর্মের ছাপ, কার্পেটে ধুলোময়লার গভীর বসতি, বাথরুমে দুর্গন্ধ এবং মুত্র ও বড়কর্মে ভর্তি ডায়াপার জমিয়ে রাখা আছে। বেসিন ও দেওয়ালের সুদৃশ্য ওয়াল পেপারে দীর্ঘদিনের দাঁত মাজার নিদর্শন স্বরূপ টুথপেস্টের লক্ষ ছিটে। কমোডে ময়লার দাগ, ঘরের কোণে ডাঁইকরা খবরের কাগজ। রান্নাঘরের অবস্থাও তথৈবচ। ডাল, ঝোলের ছিটে, ভাতের উপচে পড়া ফ্যানের শুকনো অবশিষ্ট ও তেল মশলায় মাখামাখি গ্যাস বার্নার। ধোঁয়া মোছার অভাবে পাঁশুটে বিবর্ণ মেঝে।

অন্যবার ক্যানাডায় এক বাড়িতে অন্য একরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁদের বসার ঘরের কার্পেট ও সোফার রং বেশ হালকা। মহিলা সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত, পাছে সবাই নোংরা করে দেয়। বাড়িতে ঢোকার মুখে দরজাতে জুতো খুলতে বলেন অতিথিদের। আমার সন্দেহ শুধু বাঙালিদেরই বলেন। সম্ভবত সাহেবদের পদধূলিতে এরকম আপত্তি নেই মহিলার সোফাতেও চাদর পাতা থাকে। রান্নাঘরের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতীয় রান্নার ঝঞ্ঝাটে যেতে বিরক্ত হন। রুইমাছ ভাজা মানেই তো দেওয়ালে তেলের পটকা ফেটে একশা কাণ্ড হয়। যদিও সামান্য ঢেকে ভাজলেই সমস্যা মেটে। কিন্তু তিনি ওভেনে বেক করে মাছের ঝোল রাঁধেন। নিন্দুক বঙ্গসন্তান তাঁকে রান্নায় পাশমার্ক দেন না। বাঁধাকপি তো কষতে গেলেই বিপদ। দেওয়ালের সৌন্দর্যরক্ষার্থে তাই সব পাক প্রণালী বদলে ফেলেছেন। ফলে তাঁর 'বাঁধাকপির কাঁচা মশলার ঝোল' নিয়েও খাদ্যরসিকদের সরস মন্তব্য শোনা যায়। তাঁদের বক্তব্য – দেওয়াল পরিষ্কার করার হাজার জিনিস আছে। তেল হলুদের দাগ সহজে তোলা না গেলেও। কিছুক্ষণের পরিশ্রমে উঠে যায় ঠিকই। তবে সেই বাড়তি পরিশ্রম হয়তো সবাই করতে চান না। খাদ্যগুণের কথা ভেবেও বোধহয় সেদ্ধ পক্ক চালিয়ে যাচ্ছেন।

এক মহিলাকে জানি, যিনি উদয়াস্ত বাড়ি পরিষ্কার করে চলেন। কোনো অতিথি থাকলে তাঁর মহাবিপদ। কোথায় বসলে যে জায়গাটি অগোছালো হয়ে যাবে না, বুঝতে পারা যায় না। সকাল থেকে খাওয়াদাওয়ার পাট নেই, শুধু তিনি ঝাড়ন আর স্প্রে হাতে চেয়ারে উঠছেন, নামছেন। সন্ধ্যে বেলা রান্নার চাপ অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। নেহাত অতিথির খাতিরে এবং বাড়ি অন্য লোকেদের ক্ষুধার্ত মুখ দেখে তাড়াতাড়ি ফ্রিজার থেকে হিমশীতল কাঁচা মুরগি বের করে যখন রান্নার তোড়জোড় করেন, অতিথিদের মনে হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। নিজে যে সাহায্য করবেন সে সাহস নেই। আচমকা কিছু নোংরা হয়ে গেলেই তো সর্বনাশ। অবশ্য আধুনিক কালের 'শুচিবায়ুগ্রস্ত' এরকম মহিলা এখানে আর কেউ আছেন বলে জানা নেই।

ঘরে বাইরে সামাল দিতে শিখেছেন প্রায় অধিকাংশ বাঙালি মহিলা। নিউইয়র্কের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ রাখী গাঙ্গুলির বিশাল বাড়ির প্রতিটি বাথরুমে তাঁর নিজের হাতে বোনা লেসের ঢাকা, পাপোশ দেখলে, ঝকঝকে রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর তৈরি নিখুঁত ছানার জিলিপি খেলে, মনে হবে, এই প্রফেশনাল মহিলাটির সংসারেও সমান আগ্রহ এবং যত্ন আছে। এমন অনেক বাঙালি মহিলা সারা বছর চাকরির ফাঁকে ফাঁকে শুভ দিনক্ষণ দেখে বাড়িতে সত্যনারায়ণপুজো, শিবরাত্রি, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজো, সন্তোষীমার ব্রত, দেশ থেকে গুরুদেবের আগমন ইত্যাদি উপলক্ষে বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। বহির্জগতের ব্যস্ততা এখনও এঁদের জীবনের সবটুকু সময় কেড়ে নেয়নি।


আরও ফ্লেভার! আরও স্বাদ! প্রতিদিন!
"মা, আমাকে আরও একটু দাও!"
হ্যাঁ! প্রতিদিন রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিলে বাড়ীর সবাই আরও চাইবে। ম্যাগী কিউবস্ আপনার রান্নায় আরও ফ্লেভার, আরও স্বাদ এনে দেবে। ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে রান্না করা খুবই সহজ।
রান্না প্রায় হয়ে এলে ম্যাগী কিউবস্ গুড়ো করে খাবারের ওপর ছড়িয়ে দিন। (মাথা পিছু একটি কিউব দিলেই চলবে) তারপর ভাল ভাবে নাড়ুন আর রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু আঁচে রাখুন। গড়ম গড়ম পরিবেশন করুন।
ম্যাগী কিউবস্ চিকেন এবং ভেজিটেরিয়ান প্যাকে পাওয়া যায়। একটি অথবা সাশ্রয়ী তিনটির প্যাকে পাবেন।
আজই রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে দেখুন।
MAGGI
CHICKEN CUBE
MAGGI
CUBE
100% VEGETARIAN
MAGGI ®
কিউব
কেবলমাত্র কিছু বাছা-বাছা শহরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।
CLARION D 554 BEN

জীবন–সমুদ্রে

অনীশ দেব







একটা জোরালো শব্দে দীপমালার ঘুম ভেঙে গেলো। অনেকটা যেন গুলির শব্দ, কিন্তু বেশ চাপা আওয়াজ।

চোখ খুলতেই ধবধবে মশারি পেরিয়ে জানলার শার্সি ভেদ করে নজর ছুঁয়ে গেলো বাইরের বৃষ্টিকে। এখনও ঝিরঝির। গতকাল বিকেল থেকেই শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। অথচ জায়গাটা এতো সুন্দর, তেমন করে ঘুরে দেখাই হয়ে উঠলো না এখনও।

পাশে কাঞ্চন শুয়ে আছে উপুড় হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে।

দীপমালা মশারির বাইরে বেরিয়ে এলো। আবার কানে এলো শব্দটা। আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট। কৌতূহলে ও দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো। যাতায়াতের কমন প্যাসেজ। এর শেষ প্রান্তে ওঠানামার সিঁড়ি।

একটু দূরেই বারান্দার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। মোটাসোটা চেহারা। গায়ে বেগুনি ড্রেসিং গাউন। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। হাতে একটা এয়ারগান।

বারান্দায় আর কেউ নেই। এটা হোটেলের পিছন দিক। নিচে তাকালেই চোখে পড়ে উঁচুনিচু বালির ঢিবি। বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তারপরই ঝাপসা সবুজ বনাঞ্চল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই গুটি তিনেক শালিক বালির ওপরে খেলা করছিলো। ভদ্রলোক এয়ার গান উঁচিয়ে সেদিকে তাক করলেন। আবার শব্দ হলো। শালিকগুলো একটু দূরে সরে গেলো।

ভদ্রলোক মুখ দিয়ে হতাশার চাপা শব্দ করলেন। দীপমালার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, এই নিয়ে দুশো সাঁইত্রিশটা গুলি খরচ করলাম, একটিও পালক খসাতে পারলাম না।

কথা শেষ করেই তিনি গলা ফাটিয়ে হাসলেন। বললেন, আপনারা কাল এসেছেন টের পেয়েছি। আমি আপনাদের প্রতিবেশী।

এসে থেকেই শুধু বৃষ্টি। – দীপমালা মন-খারাপ সুরে বললো।

ভদ্রলোক বন্দুকটা বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে রাখলেন। দু-পা এগিয়ে এলেন দীপমালার দিকে। সিগারেটে কড়া টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এ সময়টায় চাঁদিপুরে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। এবারেই দেখছি বর্ষার যাবার নাম নেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত পরশু। আমার মনে হয় আজই একটা হেস্তনেস্ত হবে।

হলেই ভালো, দীপমালা হেসে বললো, নইলে বেড়াতে এসে কিছুই দেখা হবে না। – একটু থেমে ও আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার সব ঘোরা হয়ে গেছে?

উত্তরে আবার হাসি। তারপর বললেনঃ এখানে ঘুরে বেড়াবার কিছু নেই, ম্যাডাম। শুধু প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য আর আশীর্বাদ।

দীপমালা হাসলো। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বাইরে টুকরোটা ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক –এদিকে আমি অনেকবার এসেছি। বিজনেসের কাজে বালেশ্বরে প্রায়ই আসতে হয়। এলেই চাঁদিপুরে একবার ঢুঁ মেরে যাই। চমৎকার নির্জন জায়গা। হনিমুনের পক্ষে তো আইডিয়াল। – ভদ্রলোক সরাসরি চোখ রাখলেন দীপমালার মুখে। গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনারাও কি হনিমুনার নাকি?

না, না। সেরকম কিছু নয় – দীপমালা লজ্জা পেয়ে গেলো। ওকে দেখে এখনও নতুন বউ মনে হয়? তাছাড়া স্বামী অমলেশ তো এখন কলকাতায়। নিশ্চয়ই খাতা-পেনসিল নিয়ে হুমড়ি খেয়ে দোকানের হিসেব-নিকেশ করে চলেছে। আর কাঞ্চন……

ভদ্রলোক মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার হনিমুন এখানেই কেটেছিলো। দোজ লাভলি লাভলি ডেজ!

ঘরের দরজার কাছ থেকে চাপা ডাক ভেসে এলো, এই দীপু!

দীপমালা চকিতে ফিরে তাকালো। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করে বললেন, নাঃ, আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। হনিমুনের মর্ম আমি বুঝি। একই হোটেলে যখন রয়েছি তখন ভালো করে আলাপ করার আরও সুযোগ পাওয়া যাবে। ওদিকে আমার বেটার হাফ-ও হয়তো ঘুম ভেঙে আমাকে না পেয়ে অভিমান করে বসে আছে। এখানে এলেই ওকে হনিমুনের রোগ পেয়ে বসে।

কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক খুব একচোট হাসলেন। দীপমালাও সৌজন্যের হাসি

ফিরিয়ে দিলো। তারপর ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ও ঘরে ঢুকতেই কাঞ্চন ওকে একেবারে জাপটে ধরলো। চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তুললো। তারই ফাঁকে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় অভিযোগ তুলে বললো, সাত সক্কালে বুড়োদের ভাষণ শুনতে ভালো লাগে বুঝি!

দীপমালা কোনো উত্তর দিলো না। কাঞ্চন তখন ছেলেমানুষের মতো উন্দাম আবেগে ওর শরীর নিয়ে মেতে উঠেছে। দীপমালার মধ্যে একটা উষ্ণতা ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছিলো। ও প্রাণপণে অমলেশের কথা ভাবতে চেষ্টা করছিলো, কিন্তু কিছুতেই সেই সাদামাটা মুখটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলো না। বরং ওর আচ্ছন্ন চোখের সামনে অনেকগুলো কাঞ্চন অসংখ্য আঙুল, ঠোঁট, মুখ নিয়ে অবশ করে দিচ্ছিলো।

বৃষ্টি থামলো বিকেলে। তবে আকাশের মুখ ভার হয়েই রইলো।

দীপমালা বৃষ্টি থামতেই বললো, চলো, বাইরে ঘুরে আসি –

কাঞ্চন বিছানায় আলসেমি করে শুয়েছিলো। আড়মোড়া ভেঙে জড়ানো গলায় জবাব দিলো, দূর, বাইরে গিয়ে কি হবে!

দীপমালা হাল ছাড়লো না। কাতুকুতু দিয়ে টানা-হাঁচড়া করে ওকে তুললো বিছানা থেকে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজগোজ সেরে ঘরের বাইরে।

পাশের ঘরের দরজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাঞ্চন বললো, তোমার রূপমুগ্ধ শালিকশিকারী জিম করবেটের খবর কি?

জানি না। এখন চলো তো –

নিচে হোটেলের ডাইনিং হল। ছোট্ট লাউঞ্জ ও হোটেলের অফিস ঘর পেরিয়ে ওরা বাইরে এলো। সামনেই বৃত্তাকার একটা বিশাল বাগান। বাগানে নানারঙের ফুল। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু আলোকস্তম্ভ। সন্ধে হলেই জোরালো বাতিটা জ্বলতে থাকে। তারপর রাত এগারোটা বাজলেই নিবিয়ে দেওয়া হয়। কাল রাতে ডিনারের সময় বেয়ারা মহাদেব বলছিলো। আলো নিবলে হোটেলের দরজা বন্ধ হয়।

বাগান ঘিরে বাঁকা পথ। সেই পথ ধরে ওরা সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিলো। পথের পাশে বাগানের গায়ে বিরাট সাইনবোর্ডে হোটেলের নাম লেখা ঃ পান্থনিবাস।

একটা তীব্র ডাক দীপমালাকে চমকে দিলো। ও মুখ ফেরালো ডান দিকে। জাল দিয়ে ঘেরা কাঠা চারেক জায়গা ঘিরে ডিয়ার-পার্ক। তিনটে হরিণ চোখে পড়ছে। গতকাল এসে পৌঁছনোর সময় তেমন করে খেয়াল করা হয়নি। দীপমালা ডিয়ার-পার্কের কাছে এগিয়ে গেলো। পিছনে পিছনে কাঞ্চনও।

একটি হরিণ আবার ডেকে উঠলো। কর্কশ বিরক্তিকর ডাক। অথচ দেখতে কি সুন্দর! টেনে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে।

কাঞ্চন বললো, বার্কিং ডিয়ার।

আশপাশে বিশাল বিশাল ঝাউগাছ। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিলো। জমে থাকা বৃষ্টির জল টুপটাপ করে ঝরে পড়ছিলো। হঠাৎ পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোকিলের ডাক শোনা গেলো। একবার, দু-বার, তিনবার।

দীপমালা হেসে ফেললো। কাঞ্চন অবাক হয়ে তাকালো ঃ হাসছো কেন?

কোকিল হরিণের ঠিক উল্টো। গলাটা কি মিষ্টি!

বাগান পেরিয়ে একটা সরু বাঁধানো পথ উঁচু হয়ে এগিয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে।

জায়গাটা ভীষণ নির্জন। টুরিস্ট বোধহয় এখানে খুব একটা আসে না। – দীপমালা বললো। ও মুখ ফিরিয়ে দু-পাশের ঝাউগাছ দেখছিলো।

কাঞ্চন দীপমালার হাত ধরলো ঃ নির্জন বলেই তো আসা, দীপু। কলকাতায় তোমাকে কি এভাবে পাওয়া যায়?

না, পাওয়া যায় না। ভাবলো দীপমালা। আর সেইজন্যেই ও এসেছে। কলকাতার সুন্দর নিটোল মসৃণ জীবনে ও হাঁপিয়ে উঠেছে। সেটাকে ভাঙচুর করতেই কিছুটা ছন্নছাড়া জীবন দরকার ছিলো। কিন্তু সে কি এইরকম?

সমুদ্রতটের ভিজে বালিতে চলে এলো ওরা। সমুদ্রের জল এখানে ঘোলাটে। তরঙ্গমালার উথালপাথালও অনেক কম। আর দু-পাশে যতোদূর চোখ যায় ধু-ধু নির্জন। দীপমালার ভালো লাগলো। এই সমুদ্র অন্য সব সমুদ্রের চেয়ে আলাদা। ছন্নছাড়া।

বিয়ের পর থেকেই অমলেশ প্রতি বছরে নিয়ম করে দীপমালাকে বেড়াতে নিয়ে যায় বাইরে। কখনও সমুদ্র, কখনও পাহাড়, কখনও বা জঙ্গল। নিখুঁত একজোড়া টুরিস্ট হয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো নিয়ম করে দেখে। অমলেশের কাছে বেনিয়মের কোনো জো নেই।

সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে ওরা হাঁটতে শুরু করলো।

কাঞ্চন বাঁ হাতে দীপমালার কোমর জড়িয়ে ধরলো। বললো, ভয় নেই, এখানে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে থাকার কেউ নেই –

বাতাস ক্রমে দুরন্ত হচ্ছিলো। আর আকাশের মেঘের স্তর ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলো। ক্রমশ আলোর আভা ফুটে উঠছিলো।

দীপমালা বললো, রাতে যদি মেঘ কেটে যায় তাহলে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাবে।

হুঁ – ছোট্ট করে বললো কাঞ্চন।

পূর্ণিমার রাতটা যাতে পাওয়া যায় সেরকম হিসেব করেই কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলো ওরা। কাঞ্চনের বেশ মজা লাগছিলো। অমলেশদা জানে তাঁর বউ খড়গপুরে ফাংশন করতে যাচ্ছে। দীপমালা একটা স্কুলে গান শেখায়। ওর গানের গলা সত্যিই ভালো। আর কাঞ্চন সেই স্কুলে তবলা-শিক্ষক। স্কুল থেকে মাঝে মাঝেই ওরা দল বেঁধে এখানে-সেখানে ফাংশন করতে যায়। এবারে খড়গপুরে ফাংশন করতে যাওয়ার নাম করেই দুজনে বেরিয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর থেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলো কাঞ্চন। দীপমালার গান ও রূপ দুই-ই ওকে মুগ্ধ করেছিলো। কেমন করে যেন ও বুঝেছিলো, মহিলার মধ্যে কোথাও একটা অভাববোধ আছে। আছে ছকবাঁধা জীবনের প্রতি একটা অভিমান। প্রথমে বউদি বলত। পরে সেটা পালটে গেছে 'দীপু'-তে।

অমলেশদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো কাঞ্চনের। মানুষটাকে ওর খারাপ মনে হয়নি। বরং দুজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করেছে ফাটলটা ঠিক কোন্‌খানে এবং কি কারণে। ওদের কোনো সন্তান হয়নি। কিন্তু ছেলেমেয়ে না হওয়াটা আজকালকার দিনে সাধারণত তেমন দূরত্ব তৈরি করে না। তাছাড়া অমলেশদার আচরণ এতো নিখুঁত, ভদ্র আর আন্তরিক যে, দীপমালার অতৃপ্তির ব্যাপারটা আরও রহস্যময় ঠেকেছিলো কাঞ্চনের কাছে।

ডান দিকে সমুদ্র আর বাঁ দিকে ঝাউগাছ, বালিয়াড়ি, কেয়াঝোপের জঙ্গল। জঙ্গলে নাকি শেয়াল আছে, মহাদেবের মুখে শুনেছে ওরা। কাল রাতে ডিনারের সময় ওর কাছ থেকেই চাঁদিপুর সম্পর্কে নানান খবরাখবর নিয়েছে কাঞ্চন। এছাড়া বালেশ্বর থেকে অটো ট্যাক্সিতে চড়ে আসার সময়েও নানান কথা জিজ্ঞেস করেছে ড্রাইভারকে। তখন বৃষ্টি পড়ছিলো। দু-পাশে কালো পর্দা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টির ছাট ঢুকে পড়ছিলো অটোর ভেতরে। দীপমালা চুপচাপ বসে প্রশ্ন-উত্তর শুনছিলো আর দেখছিলো, ডাইনে-বাঁয়ে যতোদূর চোখ যায় চাষের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে এই সরু একচিলতে পিচের রাস্তা – নাক-বরাবর, সোজা। ঠিক ওর আর অমলেশের জীবনটার মতো। কোনো বাঁক নেই। কোনো ওঠানামা নেই। আর পথের শেষে নেই কোনো ছন্নছাড়া চাঁদিপুর।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিলো। কাঞ্চন বললো, চলো, এবার ফিরি। বৃষ্টি না হলে কাল খুব ভোরে বেড়াতে বেরোবো। অবশ্য সী-বীচ ছাড়া এখানে আর দেখার বিশেষ কিছু নেই।

দীপমালা কোনো জবাব দিলো না। থমকে দাঁড়ালো। এভাবে কি ফিরে যাওয়া যাবে ছন্নছাড়া জীবনের দিকে? এখন অমলেশের মুখটা স্পষ্ট মনে পড়লো।

দেখেশুনে বিয়ে হয়েছিলো দীপমালার। বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলো। বিয়ের আগে আগে বেশ চিন্তা হতো। নানান প্রশ্নে ভরে উঠতো মনটা। কেমন হবে স্বামী? কতটুকু তার মনের মিল হবে দীপমালার সঙ্গে? ও সুখী হবে তো?

বিয়ের পর হাতে স্বর্গ পেয়েছিলো দীপমালা। এতো সুখ ওর কপালে লেখা ছিলো! অমলেশ যেন সত্যি সত্যিই ওর মনের মানুষ। অলৌকিক ক্ষমতায় টের পেয়ে যায় ওর মনের গোপন ইচ্ছেগুলো। আশ্চর্য! নিয়ম করে আদর, ভালোবাসা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। কর্তব্যে এতোটুকু খুঁত নেই কোথাও। ওরা হনিমুন করতে কাশ্মীরে গিয়েছিলো। তখন দীপমালা খুব খুশি হয়েছিলো। কিন্তু এখন ওর মনে হয় অমলেশ কাশ্মীরে নিয়ে গিয়েছিলো কারণ হনিমুনে কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়াটাই মোটামুটি নিয়ম।

প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে অমলেশ একজোড়া সোনার দুল দিয়েছিলো ওকে। আর দীপমালা তাকে দিয়েছিলো গাঢ় নীল রঙের একটা পাঞ্জাবি। তাতে সাদা সুতো দিয়ে অপরূপ কারুকাজ করা ছিলো। অমলেশ পাঞ্জাবি

ভালোবাসে। ওর ফর্সা রঙে নীল পাঞ্জাবিটা দারুণ মানিয়েছিলো।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো চমৎকার। কিন্তু ক্রমেই নিটোল নিখুঁত সুখী দিনগুলো দীপমালাকে অস্থির করে তুললো। অমলেশ সব চাহিদা পূর্ণ করতে পারলেও সন্তান দিতে পারলো না। সে বহুবার ওকে বলেছে, চলো, দুজনে গিয়ে একদিন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসি। কিন্তু দীপমালা রাজী হয়নি। দোষ কার, এটা ও রহস্যে ঢাকা রাখতে চেয়েছিলো। ওর নিটোল সুখী জীবনে অন্তত একটা প্রশ্ন থাক। একটু অ-সুখ থাক।

অমলেশের কোনো রাগ নেই, কোনো অভিযোগ নেই। যেন একটা অনুগত রোবট। সে কখনও দীপমালার সঙ্গে ঝগড়া করে না। বউয়ের চালচলন আচার-আচরণ নিয়ে কখনও ভুরুতে ভাঁজ ফেলে না। দীপমালার অবাক লাগে। নিটোল সুখের সংসারে ওর অ-সুখ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বার বার মনে হয়, সুন্দর করে সাজানো সুখের আসবাবগুলো তছনছ করে দেয়, ছত্রখান করে দেয়, ভেঙে চুরমার করে দেয়। রোবটের সংসারটায় অন্তত একটু আঁচড় পড়ুক, একটু কালি লাগুক, একটু ফাটল ধরুক। কিন্তু আট বছরেও দীপমালার আশা পূর্ণ হয়নি। অমলেশ ওর নিয়মমাফিক জীবনযাত্রা নিয়ে দিব্যি আছে।

ওরা হোটেলের কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারলো আলোকস্তম্ভের আলো জ্বলছে। চাঁদু সী-বীচ থেকে শুধু হোটেলের ছাদ দেখা যাচ্ছে। একটু চড়াই ভাঙতেই চোখে পড়লো দোতলার ঘরগুলো। কাঞ্চন আঙুল তুলে দেখালো, ওই যে, ওই ঘরটা আমাদের।

দীপমালা কিছু বললো না। ডান দিকে ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা সিমেন্টের তৈরি বেঞ্চ। বেঞ্চগুলোর আশেপাশে কয়েকটা নিয়ন আলো শালখুঁটির মাথায়। আলোগুলো এখনও জ্বালানো হয়নি। সেদিকে দেখিয়ে ও বললো, বসবে?

কাঞ্চন একবার ওকে দেখলো। তারপর ছোট্ট করে বললো, চলো –

বেঞ্চগুলো এখনও বৃষ্টি-ভেজা। কাঞ্চন পকেট থেকে রুমাল বের করে সামনের বেঞ্চটা ভালো করে মুছে নিলো। তারপর দুজনে বসলো।

কাঞ্চনের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। চাঁদিপুরে এসে দীপু দার্শনিক হয়ে গেলো নাকি! ও কনুই দিয়ে ঠেলা মারলোঃ এবারে ছাড়ছি না। একটা গান। সঙ্গে তবলা থাকলে বাজিয়ে দিতাম। তবে ঢেউয়ের শব্দ রয়েছে, ওতেই হয়ে যাবে।

দীপমালা বিষণ্ণ হাসলো। আবছায়া অন্ধকারে কাঞ্চন ওর মুখ ভালো করে দেখতে পেলো না। ছেলেটা কতো অল্পেই খুশি, দীপমালা ভাবলো। শুধু সঙ্গতই করে, সঙ্গীতের মর্ম বুঝলো না। নিস্তরঙ্গ জীবনে যে ঢেউ তোলার জন্য কাঞ্চনের সঙ্গে এই দুঃসাহসিক অভিযানে দীপমালা বেরিয়ে পড়েছিলো তার হদিস হয়তো পাওয়া যাবে না কখনও। দীপমালার হৃদের বুকে একটা ছোট্ট ঢিলও কি আশা করা যায় না!

'কার হাতে যে ধরা দেব হায়

তাই ভাবতে আমার বেলা যায়।......

দীপমালা গাইতে শুরু করলো। ছোট-ছোট ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ বেশ লাগছিলো। আকাশে মেঘের পরতের ওপিঠে ঝাপসাভাবে গোল চাঁদ দেখা যাচ্ছে। জল আর অন্ধকার এখন ছুঁয়ে রয়েছে পরস্পরকে। নিয়ন আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে কেউ।

এমন সময় দরাজ গলায় গানের কলি ভেসে এলো। বাতাসে শব্দগুলো এলোমেলো হয়ে গেলেও বোঝা যায়ঃ চল রে চল সবে ভারত সন্তান......

দীপমালা গান থামিয়ে হেসে ফেললো। একই সঙ্গে কাঞ্চনও।

দেখতে দেখতে জিম করবেট এসে হাজির। সস্ত্রীক। আলোকস্তম্ভের জোরালো আলোয় ঝাউগাছের লম্বা ছায়া পড়েছে বালির ওপর। তারই মধ্যে দিয়ে ছোট-বড় দুটো ছায়া হেঁটে এলো কাছে।

এই তো, পাওয়া গেছে! – গান থামিয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

দীপমালা বললো, গান গাইছিলেন?

হা-হা করে হাসলেন। বললেন, গানই বটে! এয়ার গান দিয়ে একটি শালিকও মারতে পারিনি, তবে এই গান দিয়ে একটি শ্রোতাকে বধ করতে পেরেছি। আমার স্ত্রী। ও হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দিই – ভালোই হলো চারজনে একজায়গায় জুটেছি –

আলাপ-পরিচয় শেষ হলো। ভদ্রলোকের নাম জিতেন কর। কাঠের ব্যবসা করেন। এখানে গাড়ি নিয়ে এসেছেন। পরশু দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরেই রওনা হয়ে যাবেন।

কাঞ্চন আলাপে-গল্পে একেবারেই উৎসাহ দেখাচ্ছিলো না। বার বার দীপমালাকে চোরা-চিমটি কাটছিলো। কিন্তু দীপমালা সে-সব গ্রাহ্য করেনি। ও আগ্রহ নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। মিসেস করের চেহারা গিন্নিবান্নি গোছের সপ্রতিভ। স্বামীর গর্বে ভদ্রমহিলা বেশ গর্বিত মনে হলো।

ওঁরা কাঞ্চনদের পাশে বসে পড়লেন। চাঁদিপুর নিয়ে জিতেনবাবু অনেক কথাই বললেন। আর কেউ না শুনলেও দীপমালা অনুগত ছাত্রীর মতো শুনছিলো। ও আর কাঞ্চন সী-বীচ ধরে যেদিকে বেড়াতে গিয়েছিলো সেদিকে আড়াই কিলোমিটার গেলেই মোহনা, বুড়ি বালাম নদীর মোহনা। সেখান থেকে জেলেদের নৌকো ছাড়ে রাতে। মাছ ধরে ওরা ফিরে আসে পরদিন সকালে। আর হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে যদি যাওয়া যায় তাহলে তিন-চার কিলোমিটার দূরেই মিলিটারি বেস। ওখানে নতুন নতুন সব আগ্নেয়াস্ত্রের পাল্লা পরীক্ষা করে দেখা হয়। মিস্টার ও মিসেস কর সেইদিকেই গিয়েছিলেন। বুড়ি বালামের মোহনা হবে আগামীকাল। আর বৃষ্টি-বাদলা না হলে ইচ্ছে আছে কাল রাতে জেলেদের নৌকোয় চড়ে রাতভর মাছ ধরার অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার করা যাবে।

মিসেস কর অনুযোগের সুরে স্বামীকে বললেন, এতো বয়েস হয়ে গেলো তবু তোমার ছেলেমানুষী গেলো না। নৌকোয় যাবে, শেষে যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়!

জিতেন কর বউয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ভয় নেই সখী, সহজে নৌকোডুবি হবে না।

তারপরই দীপমালার দিকে চকিতে ঘুরে প্রশ্ন করলেন, বলুন তো ম্যাডাম, কেন?

দীপমালা অবাক হয়ে গেলো, শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো ভদ্রলোকের দিকে।

কাঞ্চন ছোট্ট করে বললো, ওদের নৌকোগুলো সাবমেরিন বুঝি?

জিতেন কর খোঁচাটা গায়ে না মেখে বললেন, এখানকার সমুদ্রে গভীর জল পেতে গেলে বহুদূরে যেতে হয়। তাছাড়া ঢেউয়ের তেজও খুব কম। সী-বীচটা ভীষণ কম ঢালু। এই যে এখন দেখছেন পাড়ের কাছে জল, ভাটার সময় দেখবেন জল চলে গেছে তিন-চার কিলোমিটার দূরে। যদি ভিজে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ভাটার সময়ে জলের কাছে যেতে পারেন তাহলে দারুণ সব জিনিস দেখতে পাবেন –

কি জিনিস? – দীপমালা রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো। ওর চোখ মেঘলা চাঁদের আলোয় টলটল করছে। ছন্নছাড়া সী-বীচের জলসীমার রহস্য জানতে ওর যেন আর তর সইছে না।

জিতেনবাবু আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন, নানান রঙের জেলি ফিশ – লাল, নীল, হলদে, সবুজ। কতোরকম জলজ উদ্ভিদ। ছোট-বড় মাছ। হরেকরকম কাঁকড়া। নিজের চোখে সে-সব না দেখলে বুঝতে পারবেন না। কাল খুব ভোরে কর্তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না!

দীপমালা হাসলোঃ যাবো।

কাঞ্চন চটপট উঠে দাঁড়ালো। দীপমালাকে ইশারায় উঠতে বললো।

ফুরফুরে বৃষ্টিতে মুখচোখে বেশ স্নিগ্ধ ছোঁয়া লাগছিলো। দীপমালার ভিজতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু ও জানে, কাঞ্চন এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচে। সুতরাং ওরা বিদায় নিয়ে রওনা হলো হোটেলের দিকে।

ঝাউগাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে ঘাসের ওপর পা ফেলে ওরা দুজনে ফিরছিলো। আলোকস্তম্ভের জোরালো আলোয় বৃষ্টিভেজা ঘাসের শিস চিকচিক করছে। ঝাউগাছের গুঁড়ির লম্বা লম্বা ছায়ার কোল থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে লাল টুকটুকে দু-একটা কাঁকড়া। কাঞ্চন দীপমালাকে বললো, জিম করবেট আচ্ছা বেরসিক মাইরি! এদিকে বলছে আমরা হনিমুন করতে এসেছি, আবার আজগুবি গালগল্প ফেঁদে গায়েপড়ে ভিড় জমাচ্ছে। লোকটা পাগল, না মাথা খারাপ!

দীপমালা বৃষ্টির মধ্যেও মাথা সোজা করে হাঁটছিলো। হেসে বললো, সুস্থ লোক অনেক দেখেছি, কাঞ্চন। এখন আমার শুধু পাগল দেখতে ইচ্ছে করে –

ঘরে চলো, দেখাচ্ছি –

কাঞ্চন ঘুমোচ্ছিলো। অথবা ক্লান্তি ও অবসাদের ভারে তন্দ্রায় ডুবে গেছে। দীপমালার চোখেও ঘুমের ঘোর লেগেছিলো। তারই মধ্যে ও স্বপ্ন দেখছিলো:

কিছুদিন আগে কলকাতায় এক বান্ধবীর বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে দীপমালা গান

গেয়েছিলোঃ মধুর তোমার শেষ যে না পাই … …। সঙ্গে তবলা বাজিয়েছিলো কাঞ্চন। গানের শেষে দারুণ তারিফ জুটেছিলো দীপমালার ভাগ্যে। শ্রোতাদের মধ্যে দু-একজন নামী গায়কও ছিলেন। দীপমালা পরে কাঞ্চনকে বলেছিলোঃ এই গানটা আমার ভীষণ প্রিয়। গানের অর্থটা কি সুন্দর, বলো?

কাঞ্চন হেসে বলেছে, দীপু, অর্থ-টর্থ জানি না; আমি তবলচি, আমার গানের তাল নিয়ে কথা। অত ভাবতে গেলে তবলা শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

দীপমালা একটা ধাক্কা খেয়েছিলো। অর্থের চেয়ে তালটাই বড় হলো! এ যেন চলার পথে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে শুধু তাল মিলিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। পাকা তবলচির মতো।

স্বপ্নে দীপমালা অবাক হয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়েছিলো। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছিলো, কি বলছো তুমি, অর্থ জানার দরকার নেই?

কাঞ্চন তবলা বাজাচ্ছিলো। হাসিমুখে বললো, না, নেই।

হঠাৎই দেখলো একটা গাছতলায় হিসেবের খাতা নিয়ে অমলেশ বসে আছে। দীপমালা চিৎকার করে স্বামীকে লক্ষ্য করে একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো।

অমলেশ কলম থামিয়ে মুখ তুলে তাকালো। স্মিত হেসে বললো, হ্যাঁ, মালা, দরকার আছে বইকি। তবে সেভাবে তো ভাবিনি। তুমি যখন বলছো … …

দীপমালা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো।

ঘুমের ঘোর ভাঙতেই ও টের পেলো চোখে জল। তাহলে স্বপ্নের মধ্যে ও সত্যি সত্যিই কাঁদছিলো?

রাতপাখির তীব্র স্বর দীপমালাকে চমকে দিলো। ঘরের জানলা দিয়ে চোখ গেলো বাইরে। আলোকস্তম্ভের সার্চলাইটের আলোয় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কয়েকটা ঝাউগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। আর তার ঠিক ওপরেই একটুকরো আকাশ। পরিষ্কার। কয়েকটা তারা মিটমিট করছে। বৃষ্টি নেই। মেঘও নেই।

দীপমালা ঘর ছেড়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এলো পিছনের লম্বা বারান্দায়। এখন রাত কতো? তবে সার্চলাইট যখন জ্বলছে তখন নিশ্চয়ই এগারোটা বাজেনি।

বারান্দায় আবছায়া অন্ধকারে পা দিয়েই ছায়ামূর্তিটা ওর নজরে পড়লো। মুখের কাছে সিগারেটের অগ্নিবিন্দু জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে অস্পষ্ট রেখায়। চশমার কাচ চকচক করছে। তাকিয়ে রয়েছেন ধু-ধু বালিময় প্রান্তরের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদ অকৃপণ জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে সেখানে। উঁচুনিচু রুপোলি চাদরের এখানে-ওখানে অন্ধকার, কেয়াঝোপের জটলা।

জিতেন কর আপন মনেই কি সব বিড়বিড় করছিলেন। দীপমালাকে খেয়াল করতেই শিথিল পায়ে কাছে এগিয়ে এলেন। জড়ানো গলায় বললেন, ছাদে যাবেন নাকি, ম্যাডাম?

হুইস্কি মেশানো ভারী বাতাস দীপমালার নাকে এলো। ও একমুহূর্ত ভাবলো। পূর্ণিমার চাঁদ, চাঁদের আলো ওকে ভীষণ টানছিলো। ছাদে না গেলে চাঁদ দেখা যাবে না। ও ছোট্ট করে বললো, চলুন –

বারান্দা ধরে এগিয়ে শেষপ্রান্তে ছাদের সিঁড়ি। সিঁড়ির ধাপে প্রথম পা রেখে দীপমালা বললো, মিসেস কর –?

জিতেনবাবু শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলেন। তারপর একতলার দিকে মুখ বাড়িয়ে ভারী গলায় মহাদেবের নাম ধরে ডাকলেন। বললেন, ছাদে দু-পেগ হুইস্কি দিতে। তারপর সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। পাশে দীপমালা। হুইস্কি, রাত এবং পরপুরুষ, তিনটের কোনটাই দীপমালাকে অস্বস্তি বা আশঙ্কায় ফেলেনি। সাবধান থেকে থেকে ও ক্লান্ত হয়ে গেছে।

ছাদে পা দিয়েই প্রথমে ভয় করে। প্রকৃতি এত সুন্দর! সামনে ঝাঁকড়া ঝাউগাছগুলো হোটেলের ছাদ ছাড়িয়েও বিশ ফুট উঠে গেছে। হাওয়ায় দুলছে, খসখস শব্দ তুলছে।

মাথার ওপরে বিশাল চাঁদ। ছাদ জ্যোৎস্নায় মাখামাখি। পিছনের প্রান্তর সাদা চাদর। তার শেষে অন্ধকার গাছের দল। আরও আরও দূরে দিগন্তে চিকমিকে রঙিন আলোর মেলা। বালেশ্বর শহরের আলো ওগুলো। কাছ থেকে দেখলে যা সাধারণ আলো, দূর থেকে সেটাই জড়োয়া গয়না। দূরত্ব সাধারণকে অসাধারণ করে।

এমন সময় দূর থেকে কোকিলের ডাক ভেসে এলো। নির্জন প্রকৃতির মাঝে কি অদ্ভুত সেই সুমিষ্ট স্বর! জিতেনবাবু হঠাৎই কোকিলের ডাক নকল করে জোরে ডেকে উঠলেন। চুপ করে রইলেন। কোকিলটা একটু পরেই সেই ডাকের উত্তর দিলো। আবার ডাকলেন জিতেন কর। আবার উত্তর এলো। কয়েকবার এরকম করে হেসে উঠলেন। বললেন, হনিমুনের সময়ে যখন এসেছিলাম, তখন একটা কোকিল এইরকম করেই আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলো। এখনো বেচারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে!

দীপমালা যেন ডুবে যাচ্ছিলো। এমন সময় ছাদের দরজায় শব্দ হলো। মহাদেব হুইস্কি আর ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে এসেছে। জিতেনবাবুর ইশারায় ও সেগুলো রাখলো ছাদের ফুটখানেক চওড়া পাঁচিলের ওপরে। তারপর কোথা থেকে যেন অ্যালুমিনিয়ামের দুটো হালকা চেয়ার নিয়ে এলো।

মহাদেব চলে যেতেই জিতেন কর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে এসে বসলেন। হুইস্কিতে জল মিশিয়ে গেলাসে প্রথম চুমুক দিলেন। দীপমালা ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। বাতাসে ওর শাড়ির আঁচল উড়ছে। জিতেন কর মুখ ফিরিয়ে তাকালেনঃ ম্যাডাম, যদি অসুবিধে না হয় পাশে এসে বসতে পারেন –

দীপমালা এলো। বসলো। আকাশে দু-একটা হালকা মেঘের টুকরো কোথা থেকে যেন উড়ে এসেছে। ভেসে যাচ্ছে চাঁদ পেরিয়ে। মেঘের ছায়া সরে যাচ্ছিলো ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে। সেদিকে কয়েক পলক দেখে জিতেনবাবু ভারী গলায় অস্ফুট স্বরে বললেন, লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো … …। জীবন ছায়া হোক ক্ষতি নেই, ম্যাডাম, কিন্তু তার ওয়াকিংটাই আসল কথা। চল রে চল সবে … …

কথার শেষদিকটা জড়িয়ে গেলো। দীপমালা কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। তাই হঠাৎ বললো, সন্ধেবেলা বৃষ্টিতে ভিজলেন?

জিতেন কর চমকে ফিরে তাকালেনঃ কি বললেন? ও, হ্যাঁ … … কিন্তু আমি খুব অন্যায় কাজ করেছি। বৃষ্টিতে ভিজে নয়, নমিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে … …

দীপমালার অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো ঘণ্টা-খানেক আগে পাশের ঘর থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি-কান্নাকাটি কানে এসেছিলো। এখন হঠাৎ করে এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় ও অস্বস্তি পেলো।

জিতেনবাবু গেলাসে পর পর চুমুক দিলেন। জড়ানো গলায় থেমে থেমে বললেন, আমি একটা ব্রুট, ম্যাডাম। নমিতাকে আমি অনেক কষ্ট দিই। – বাঁ হাত তুলে নাটকীয়ভাবে শূন্যে ঘোরালেন, এইরকম একটা লাভলি স্পটে এসেও আমি ওর ওপরে টরচার করলাম –

দীপমালার মনে পড়ছিলো, অমলেশ কখনও ওকে কষ্ট দেয়নি – টরচার তো দূরের কথা। দীপমালার জীবনটা ছায়া নয়, তার শরীর আছে। কিন্তু সে কতোটা চলমান তা বলা মুশকিল। চলে হয়তো, কিন্তু তা বোঝার উপায় নেই। কারণ চলার পথে ওঠানামা নেই। পথের দু-পাশের দৃশ্যপট বদলায় না। অনেকটা নিশ্চল মৃতদেহের মতো।

জিতেন কর আরও কিসব বলছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ পাঁচিলের ওপরে একটা ঘুষি মারলেন। গলার স্বর ভেঙে গেলো। কান্না মিশে গেলো তাতেঃ আমি যে কখন কি করি তার কোনো ঠিক নেই। আমার সবটাই কেমন উল্টোপাল্টা ছন্নছাড়া।

নির্জন রাতে শোনা গেলো 'চোখ গেলো' পাখির ডাক। দীপমালার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। ও নরম গলায় বললো, আপনি আপনার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসেন, তাই না?

হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যদি বলি ভীষণ ভালোবাসি, আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার খাম-খেয়ালিপনায় সায় না দিলেই আমি হুলস্থুল বাধাই, ছন্নছাড়া কাণ্ড করি … …। – কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আপনাকে দারুণ ভালোবাসে, তাই না ম্যাডাম?

প্রশ্নের সুর শুনেই বোঝা যায় জিতেন কর কোনো উত্তর প্রত্যাশা করছেন না। কারণ উত্তরটা যে 'হ্যাঁ' সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ নেই এতোটুকু।

কিন্তু দীপমালা উত্তর দিতে চাইলো। কণ্ঠনালীতে এক অসহ্য চাপ। দীপমালার চোখের সামনে অমলেশ ও কাঞ্চনের অস্পষ্ট মুখ একই সঙ্গে ভেসে উঠলো। ও অনেক চেষ্টা করে উচ্চারণ করলোঃ কাঞ্চন আমার স্বামী নয়, মিস্টার কর। আমার স্বামী অমলেশ কলকাতায়। ওকে মিথ্যে বলে এই ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে এসেছি।

জিতেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চেয়ারের পিঠে হাতের ভর রাখলেন। অপলক চোখে সামনে বসা মেয়েটিকে দেখতে চেষ্টা করলেন। এমন সময় সার্চ লাইটের আলো নিবে গেলো। একটুকরো গাঢ় মেঘ ঢেকে দিলো জ্যোৎস্নায়

রাত। সামনের ঝাউগাছগুলো আঁধার হয়ে গেলো। জিতেন কর একটা হাত বাড়িয়ে দিতে গেলেন দীপমালার দিকে। কিন্তু বেসামাল হাত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাঁচিলের ওপরে রাখা জলের বোতলে ধাক্কা দিলো। বোতলটা ছিটকে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছাদের দরজার কাছ থেকে কেউ ডেকে বললো, দীপু, খাবে চলো। ঘরে খাবার দিয়েছে।

জিতেনবাবু অথবা দীপমালা আঁধারে দাঁড়িয়ে তৃতীয় মানুষটিকে হঠাৎ করে চিনে উঠতে পারলো না।

খুব ভোরে সী-বীচে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিলো। কিন্তু মহাদেবের হৈ-চৈ চেঁচামেচি সেই আগ্রহের সঙ্গে কিছুটা কৌতূহলও মিশিয়ে দিলো।

ওরা একতলায় নামতেই অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহাদেব উত্তেজিত গলায় কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে বললো, বাবু, সমুদ্রে একটা লাশ ভেসে উঠেছে!

জিতেনবাবুও সস্ত্রীক বেরোচ্ছিলেন। এখানে ডুবে কেউ কখনও মারা যায়নি। সমুদ্র অনেক শান্ত, তাছাড়া লোকজন আসেও কম। পুলিশে ফোন করেছি। বালেশ্বর থেকে আসতে সময় লাগবে। – একটু থেমে কি মনে হতেই বললেন, তবে জগন্নাথের কৃপা, আমার হোটেলের কোনো বোর্ডারের কিছু হয়নি।

ওরা অনেকে মিলে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলো। দীপমালা খুব দ্রুত পায়ে সকলের সামনে পৌঁছে গেলো। জিতেনবাবু কাঞ্চনকে বার বার দেখছিলেন। নমিতার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন। অন্যান্য সবার এলোমেলো গুঞ্জন কানে আসছিলো।

বাগানের পাশ কাটিয়ে ওরা উঁচু রাস্তায় এলো। দু-পাশের ঘাস শিশিরে ভেজা।

রাস্তার ঢাল বেয়ে নামতেই চাঁদিপুরের ছন্নছাড়া সমুদ্র, ছন্নছাড়া সমুদ্রতট দীপমালার চোখে পড়লো। সূর্য এখনও ওঠেনি। তবে আকাশে গোলাপী আভা ফুটেছে। ভোরের আশ্চর্য মায়া ছড়িয়ে গেছে সামনের দৃশ্যপটে।

ভাটার টানে সমুদ্র এখন অনেক দূরে। অন্তত দু-আড়াই কিলোমিটার তো হবেই। জলে-ভেজা কাদাটে বালিতে এলোমেলো কিছু পদচিহ্ন। কয়েকটি মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তারা এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তার ঠিক পাশেই একটি অবয়ব চোখে পড়ছে যেন।

পিছনের গুঞ্জন অনেক জোরালো হয়েছে। দীপমালা ফিরে তাকিয়ে কাঞ্চনকে একবার দেখলো। তারপর আচমকাই ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ওর ছুটন্ত পায়ের চাপে বালি বসে গিয়ে জল বেরিয়ে আসছিলো। পিছন থেকে কাঞ্চনের বিমূঢ় ডাক ভেসে এলোঃ দীপু – কি হচ্ছে! দাঁড়াও!

দীপমালা এতোটুকুও গতি কমায়নি। দূরের ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে শুয়ে থাকা নিথর দেহটাও। দীপমালা জানে, এইভাবে ছুটতে ছুটতে ও যখন পৌঁছে যাবে জলের কিনারায়, তখন আবিষ্কার করবে ছন্নছাড়া সমুদ্রের বেহিসেবী সৌন্দর্য। লাল-নীল জেলি ফিশ, নানান রকম জলজ উদ্ভিদ, রঙিন ছোট-বড় মাছ। আর একটি মৃতদেহ। যা কখনও হয়নি, হতে পারে না, সেরকম ঘটনাই বার বার ঘটে যায় এখানে।

পিছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কাঞ্চনের ডাক। জিতেনবাবুও বোধহয় একবার দীপমালার নাম ধরে ডাকলেন।

ও পিছন ফিরে তাকালো না। বুকে হাঁফ ধরছে ক্রমশ। আরও স্পষ্ট হচ্ছে সমুদ্ররেখা। মানুষ-গুলো। ও আরও কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো।

মৃতদেহের পরনের গাঢ় নীল পাঞ্জাবিটা একটু পরেই স্পষ্ট হলো। পাঞ্জাবিটা কি খুব চেনা? আরও কাছে পৌঁছলে কি চোখে পড়বে সাদা সুতোর অপরূপ কারুকাজ? সমুদ্রের জল ছলকে ছলকে উঠছে নিথর শরীরটার ওপরে। মাথার ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল শিথিল হয়ে যাচ্ছে জলের আলোড়নে। এমলেশের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো কাঞ্চনের কথা। সমুদ্রের বুকে বাতাস হঠাৎই তীব্র হলো। দীপমালার চোখ জ্বালা করে উঠলো।

দীপমালা! দীপমালা! – শুধু জিতেনবাবুর ডাকই কানে এসে পৌঁছচ্ছে।

দীপমালা পিছনে তাকালো না। ওর কাতর চোখের সামনে ভোরের সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়লো মৃতদেহের ওপরে। সমস্ত নিয়ম হিসেব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছিলো। জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো একটু একটু করে।



প্রথম মহিলা ট্রাক-ড্রাইভার পার্বতী দেবী

পার্বতী দেবী সম্ভবত শুধু ভারতবর্ষেরই নন – সমগ্র এশিয়ারও প্রথম মহিলা ট্রাক ড্রাইভার। ট্রাক চালানো তাঁর শখ নয়, বরং পেশা। ট্রাক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি।

রেগর-সম্প্রদায়ভুক্ত পরিণত যৌবনা পার্বতী দেবীর নিবাস মধ্য প্রদেশের মন্দসৌর শহর। রাজস্থানের সীমান্তে মন্দসৌর শহর রত্‌লাম ও উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী।

ভাইবোনদের মধ্যে পার্বতী সবচেয়ে বড়। বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সেইজন্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বার সময়ে বারো-তের বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে পিতাকে সাহায্য করতে হল রোজগারে।

তাঁর বাবার ছিল জ্বালানী কাঠের ব্যবসা। কিন্তু এতে তেমন লাভ হত না। পার্বতী তখন কাঠের ছোটখাট খেলনা এবং ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে শুরু করলেন। ছোট এক বোনও এই কাজে সাহায্য করতে লাগল। এই ব্যবসা ঠিক ভাবে চলছে দেখে ফার্নিচার বানাতে শুরু করলেন পার্বতী। কিন্তু তাঁদের পরিবার খুব বড় – সাত বোন, চার ভাই, মা বাবা। ছোট ফার্নিচারের ব্যবসায়ে পুরো পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হত না।

সতের বছর বয়সে পার্বতীর বিয়ে হল। কিন্তু স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ভাল লাগল না তাঁর। বিশেষ করে আর পাঁচটা সাধারণ সাংসারিক মেয়ের মতো ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে গৃহস্থালি করার মতো মনোভঙ্গিই তাঁর ছিল না। শ্বশুর বাড়ির লোকেদের প্রভুত্ব, দাসীর মতো আজ্ঞা পালন করা অসম্ভব হলো তাঁর পক্ষে। দরিদ্র ঘরে জন্ম হলেও বালিকা বয়স থেকেই পার্বতী দেবীর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মনির্ভর শক্তিতে বিশ্বাস।

তাঁর বাবার ব্যবসায় ছিল জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসা। জঙ্গল থেকে শহর পর্যন্ত সেই কাঠ আনতে তাঁর খুব কষ্ট হত। অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যেত না, আবার পাওয়া গেলেও ট্রাক-ড্রাইভারদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হত সেই কাঠ শহরে আনবার জন্যে। অনেক সময় ড্রাইভাররা তার কাঠ বহন করতে অস্বীকার করত।

শ্বশুর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসবার পরে পিতার কঠিন জীবন সংগ্রাম তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। সব দেখে-শুনে পার্বতীর মনে একটা ইচ্ছা উঁকি দিতে শুরু করল – যদি তাঁর নিজেরই একটা ট্রাক থাকত! অনেক কষ্টের হাত থেকে তাঁরা সবাই তাহলে রেহাই পেতেন, আসান হত রুজি-রোজগারেও।

আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে সে প্রয়াস যে অসফল হয় না – পার্বতী তা প্রমাণ করে দিলেন স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিস্তিতে একটি ট্রাক কিনে (১৯৭৬ সালে)। একটু চেষ্টার পরে নিজেই ট্রাক চালানো শিখে নিলেন তিনি। বাচ্চা বয়স থেকেই এই বাহনটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, একে যে ভালোভাবেই চেনেন। তাই বিরাট শরীর নিয়ে এই বাহনটিও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করল। কিন্তু পরিবহণ বিভাগের কর্মচারীরা এক মহিলাকে ভারী ট্রাক চালাবার অনুমতি দিতে চাইলেন না। শুধু হালকা গাড়ি চালাবার লাইসেন্স পেলেন তিনি (২৪ জুলাই, '৭৮)। আর এর দু বছর পরেই ভারী বাহন চালাবার লাইসেন্সও পেয়ে গেলেন কয়েকবার ট্রায়ালের পরে।

জঙ্গল থেকে কাঠ আনবার সমস্যার তো সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি প্রবল সমস্যা দেখা দিল। রাজ্য সরকার বনসম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ করার পরে জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ আনবার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। পার্বতী তখন জঙ্গলের কাঠ ঠিকা নেওয়া শুরু করলেন। পুরুষ ঠিকাদাররা তাঁর কাণ্ড দেখে প্রথমে তাঁকে ঠিক প্রতিযোগী না ভেবে বরং একটু হাসিঠাট্টাই করতে লাগল। কিন্তু নির্ভয়ে একাগ্রচিত্তে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন পার্বতী। দিনে-রাতে নিজের ট্রাক চালিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসা অব্যাহত রইল তাঁর।

বাকপটু ও নিঃশঙ্ক হবার ফলে জঙ্গলে পার্বতীকে কেউ বিরক্ত করতে সাহস পায়নি। বন বিভাগের কর্মচারীরা অনেক সময়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর ট্রাকে চড়ে শহরে যেতে চাইলে পার্বতী সরাসরি তা অস্বীকার করেছেন। ফলে তারা তাঁর কন্ট্রাক্ট বাতিল করার ধমকিও দিয়েছিল। পার্বতী এ সমস্ত কিছু পরোয়া করেননি। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাঁকে তাঁর ব্যবসায়ে এগিয়ে দিয়েছে।

জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসবার ব্যবসা ভালভাবে চলতে থাকলে একটা ট্রাকে আর কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না। পার্বতী তখন মন্দসৌরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাছে গিয়ে আর একটি ট্রাক কিনবার জন্যে ঋণ চাইলেন। স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাব ও সফল ব্যবসায়ী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে আর একটি ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। পার্বতী এখন দুটি ট্রাকের মালিক। গাড়ি মেরামতের জন্যে যেসব টেকনিক্যাল জ্ঞান দরকার পার্বতী মোটামুটি সব শিখে নিয়ে নিজেই দুটি ট্রাকের দেখাশুনো করেন।

পার্বতী নিজে তো বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেননি, কিন্তু ভাইবোনদের ভালভাবে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। এক ভাই ইন্দোর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিতে যাচ্ছেন, এক বোন বি এস সি পাশ করেছে মন্দসৌর কলেজ থেকে। ভাইবোন সবাই তাঁকে সাহায্য করে। তিনি ভাই আর এক বোনের বিয়েও দিয়েছেন পার্বতী।

মাটির ঘরে জন্ম হয়েছিল পার্বতীর। নিজের রোজগারে এখন তিনি পাকা বাড়ি বানিয়েছেন। সেখানে মা-বাবা, ভাইবোন সবাইকে নিয়ে থাকেন। আধুনিক জীবনের সব উপকরণ রয়েছে তাঁর বাড়িতে – ড্রয়িং রুমের স্টিরিয়ো সেট থেকে কিচেনে গ্যাস ও ইলেকট্রিক গ্যাজেট। ট্রাক-ড্রাইভারদের যদি কোনো রেস হয় –তাতে যোগ দেবার খুব ইচ্ছে পার্বতীর। কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে এক সঙ্গে আট শো কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা পাড়ি দিয়েছেন তিনি। ট্রাক চালাবার সময়ে তাঁর চোখ থেকে বিদায় নেয় ঘুমের আমেজ। অন্য ট্রাক-ড্রাইভারদের মতো রাস্তার ধারে হোটেল-রেস্টুরেন্টে চা-খাবার খাওয়া পছন্দ করেন না পার্বতী দেবী। খুব বেশি দরকার হলে নিজের ট্রাকে চা আনিয়ে নেন, খাবার বানাবার উপকরণও ট্রাকে থাকে।

পুরুষশাসিত সমাজে স্বনির্ভরা, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণা পার্বতী দেবী যথার্থ আর্থিক-স্বাধীন নারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপন ভাগ্যকে নিজে জয় করেছেন। পার্বতী দেবী সভা-সমিতি বা ড্রয়িংরুমে উত্তাপ-সৃষ্টিকারী, বাকসর্বস্ব বা তথাকথিত শুধু এক 'লিবারেটেড' মহিলাই নন, নারী স্বাধীনতারও মূর্ত প্রতিমা।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

সিংহদুয়ার পেরিয়ে

শ্রীমতী মনজিত কাউর রাষ্ট্রপতি শ্রীজ্ঞানী জৈল সিংয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার এবং রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল হোস্টেস। একটি অন্তরংগ সাক্ষাৎকারে নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সংগে সংগে ভারতের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী শ্রীজৈল সিংজির দৈনন্দিন জীবনের অজানা দিকগুলির পরিচয় দিয়েছেন।

'আমরা ৩৪ নং নর্থ অ্যাভিনিউতে থাকতাম। একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনের গায়ে। যাঁরাই গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে আসতেন তাঁদের রাষ্ট্রপতিভবন দেখাতে নিয়ে যেতাম। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আমাদের বাড়িতে এত লোক আসতেন যে সারাঘর ভরে যেত – পড়াশোনা করার জন্যে একটুও নিরালা জায়গা পেতাম না। তাই যখন কাউকে রাষ্ট্রপতিভবন দেখাতে নিয়ে যেতাম তখন মনে মনে ভাবতাম এ বাড়িটা আমাদের হলে ঘরের সমস্যা একেবারেই মিটে যেত' – কথাগুলো আমার নয়, এগুলো রাষ্ট্রপতি শ্রীজ্ঞানী জৈল সিংজির কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনজিত কাউরের যিনি রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল হোস্টেস।

সাধারণত রাষ্ট্রপতির পত্নী এই সম্মানের অধিকারিণী হন। কিন্তু জ্ঞানীজির স্ত্রী শ্রীমতী প্রধান কাউর গ্রামেই থাকেন। সেই জন্যে জ্ঞানীজির দুই মেয়ে শ্রীমতী গুরদীপ কাউর ও শ্রীমতী মনজিত কাউর – এই অসীম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছেন। এঁরা দুইজনেই ডাক্তার। ডাঃ গুরদীপ কাউরই আসলে অফিসিয়াল হোস্টেস। কিন্তু যেহেতু উনি লুধিয়ানা হাসপাতালের ডাক্তার (ওখানে শ্বশুর বাড়িও) তাই সব সময় দিল্লিতে থাকা ওঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সেইজন্য ছোট বোন ডাঃ মনজিতই এ ভার নিয়েছেন। ইনি দিল্লির নর্থ অ্যাভিনিউ ডিসপেন্সারির ডাক্তার। সকাল ৭টা থেকে ১২টা আবার বিকেল ৩টে থেকে ৬টা পর্যন্ত ওঁর ডিউটি। অজস্র রোগীর ভিড় ছাড়াও নানা লোকের নানাবিধ ব্যক্তিগত সমস্যার সম্মুখীনও ওঁকে হতে হয়। সোজাসুজি রাষ্ট্রপতির কাছে পৌছনো তো সোজা কথা নয় – তাই ওঁর সাহায্যেই পৌছনোর চেষ্টা।

সুকন্যার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে 'সিংহদুয়ার পেরিয়ে' ঠিক বিকেল পাঁচটায় হাজির হলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে। দরজাতেই হাসিমুখে একজন অফিসার আমাকে রিসিভ করলেন। তারপর তকমা-আঁটা উর্দিপরা একজন বেয়ারা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কালো সাদা মার্বেলের মেঝেতে পা ফেলে ফেলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের বিরাট বড় বড় অয়েল পেন্টিং পিছনে ফেলে বেয়ারার সংগে লিফট পর্যন্ত এলাম।

লাল কার্পেট বিছানো লিফটে অন্য একজন উর্দিধারীর জিম্মাতে উপরে এলাম। এখানের বারান্দা পুরো লাল কার্পেটে মোড়া – তার নরম বুক মাড়িয়ে বারান্দার এককোণে এক ড্রইংরুমে এসে বসলাম। এ ঘরের কার্পেট আবার শ্যাওলা সবুজ রঙের – সংগে ম্যাচ করা সোফা ও পর্দা। ওখানে তিনজন ভদ্রমহিলা আগে থেকেই বসে আছেন। রাষ্ট্রপতিজির সংগে দেখা করতে এসেছেন – মানে একটা সমস্যায় পড়েছেন – রাষ্ট্রপতিজির হস্তক্ষেপে যদি সমস্যার সমাধান হয় সেই আশায় এসেছেন। একজন ছিলেন মিসেস ত্যাগী – উনি জলন্ধরে সঞ্জীবনী নামে একটি নারী নিকেতনের সেক্রেটারি। সংগে দুটি অল্পবয়সী মিষ্টি মেয়ে। অল্প কিছুদিন আগে ওদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু 'দহেজ' মানে পণপ্রথার শিকার। একজনের বাবা ভিডিও সেট দিতে পারেননি আর একজনের বাবা ৫০ হাজার টাকা নগদ, ফলে দুজনের কেউই স্বামীর ঘর করতে পারছেন না।

বুঝুন অবস্থাটা – আমরা চাঁদে চলে গেলাম, কিন্তু মনের প্রসারতা এখনো বাড়াতে পারলাম না।

এমন সময় আমার ডাক পড়ল রাষ্ট্রপতির এক্সক্লুসিভ ড্রইং রুমে। গাঢ় নীল রঙের কার্পেটের উপর ম্যাচ করা সোফা, পর্দা। ঘরের চারিদিকে অজস্র সুন্দর সুন্দর কিউরিও সাজানো। ঘরের এক কোণে ইকেবানা স্টাইলে ফুল সাজানো। দেওয়ালে রাষ্ট্রপতিজির একটি সুন্দর ফোটোগ্রাফ। আর একদিকের দেওয়ালে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের একটি সুন্দর পেন্টিং।

এর আগে এ ঘরে কয়েক বার আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বদলের সংগে সংগে এঘরের সাজসজ্জা ও স্টাইল বদলায়। একটু পরেই সালোয়ার কামিজে সুসজ্জিতা রাষ্ট্রপতিজির অফিসিয়াল হোস্টেস ডাঃ মনজিত কাউর এসে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

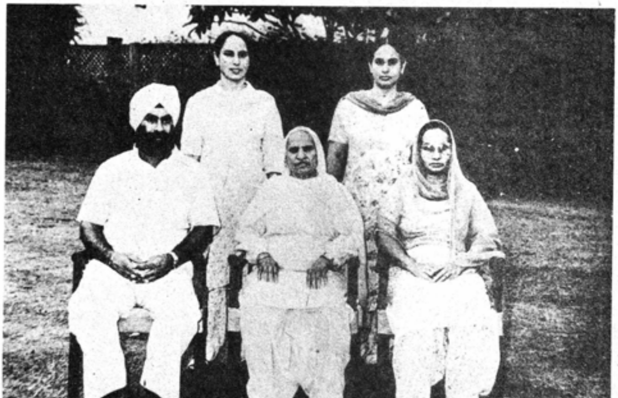
সুকন্যার পাঠক-পাঠিকাদের তরফ থেকে ওঁর একটি অন্তরংগ সাক্ষাৎকার নেওয়া হল।

প্র : রাষ্ট্রপতিভবনের এই কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্যে এসে আপনার হাঁফ ধরে না?

উত্তর : না। বরং বেশ ভালই লাগে। নিত্যি কত নতুন দেশের লোকের সংগে ঘনিষ্ঠতা ও আলাপের সুযোগ হয়। আর কঠিন নিয়ম ঠিক বলব না তবে প্রচুর প্রোটোকল মানতে হয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে এবং বউ। সুতরাং হুটহাট বাইরে বেরোনোর অভ্যাস কোনো কালেও ছিল না। সুতরাং সে বিষয়ে কোনো অসুবিধা ভোগ করি না।

প্র : আপনি এর আগে কখনো ভেবেছেন যে এখানকার বাসিন্দা হয়ে থাকবেন?

উত্তর : আমি তখন ছোট ছিলাম। আমরা ৩৪ নং নর্থ আভিনিউয়ে থাকতাম, একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনের গায়ে। যাঁরাই গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে আসতেন তাঁদের রাষ্ট্রপতি ভবন দেখাতে নিয়ে যেতাম। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আমি সোজা ভিতরে ঢুকে সব ঘুরে ঘুরে দেখাতাম। আমাকে কেউ-ই বাধা দিত না।



জৈল সিং, তাঁর স্ত্রী প্রধান কাউর এবং বড় মেয়ে যোগিন্দর কাউর। পিছনে ডাঃ গুরদীপ কাউর, ডাঃ মনজিত কাউর

আমাদের বাড়িতে এত লোক আসত যে, পড়াশোনা করার জন্যে একটুও নিরালা জায়গা পেতাম না। তাই যখন কাউকে রাষ্ট্রপতি ভবন দেখাতে নিয়ে যেতাম মনে মনে ভাবতাম এ বাড়িটা আমাদের হলে ঘরের সমস্যা একবোরেই মিটে যেত। স্বপ্নও কখনো কখনো সত্যি হয়। (মিষ্টি করে হাসলেন উনি)

প্র : আপনি তো একজন ডাক্তার। আগেও ডাক্তারি করতেন এখনও করেন। লোকের ব্যবহারে কোনো ফারাক অনুভব করেন ?

উত্তর : খুব করি। আগে আমাকে সকলে শুধু ডাক্তার মনে করতেন। আর এখন ডাক্তার আর মহা ক্ষমতাশালী মহিলা বলে মনে করেন।

প্র : কী রকম ?

উত্তর : ডাক্তারি তো করতেই হয়। তাছাড়া নানাজনে নানা সমস্যার ডালি আমার সামনে মেলে ধরেন। মনে করেন সব সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি আমার হাতেই আছে।

প্র : কী ধরনের সমস্যা ?

উত্তর : বদলি, প্রমোশন, চাকরি এ তো আছেই। তাছাড়া মেয়েদেরও নানারকম সমস্যা আছে। যেমন পণপ্রথা। এ ছাড়াও আরো নানা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে অনেকে আসেন। আমি যতটা পারি আমার বাবাকে বলে মেয়েদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। তবে বদলি, চাকরি, প্রমোশন এসব সমস্যাগুলো যদিও খুব কঠিন তবে আমি এগুলো সযত্নে এড়িয়ে যাই। অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হন তা আর কী করা যাবে ?

প্র : আমাদের দেশের মেয়েরা ঠিকমতো মর্যাদা পাচ্ছেন কি ?

উত্তর : আমি মনে করি আমাদের এই পুরুষশাষিত সমাজে মেয়েদের সব সময় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রায়ইতো কাগজে দেখা যায় বিয়ের সময় 'দহেজ' মনোমত হয়নি বলে কত মেয়েকে খুন করে ফেলা হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর যুগে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তবে আমার মনে হয় মেয়েরা যতদিন না আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হবেন ততদিন তাঁদের এইভাবে দাবানোর চেষ্টা করা হবে। আর মায়েরা যদি সংসারে অসম্মানিত হন তবে তাঁদের সন্তান-সন্ততিও মানসিকভাবে সজীব হতে পারে না।

প্র : রাষ্ট্রপতিজির কথা কিছু বলুন।

উত্তর : তিনি যেমন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি তেমনি আমার বাবাও। ঘরে উনি খুব রিলাক্সড থাকেন, আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতোই। যখন আমাদের ভাই-বোনেরা একত্রিত হই তখন উনি আমার খুব লেগপুলিং করেন। আমি কোন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কী কথা বলেছি, মার্গারেট থ্যাচারের দিকে তাকিয়ে কীভাবে হেসেছি ইত্যাদি নানা ব্যাপার নিয়ে আমাকে টিজ করেন।



ছবিতে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় জিয়া-উল-হক, চতুর্থ জৈল সিং, পঞ্চমে মনজিত কাউর ও সর্ব দক্ষিণে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

প্র : আপনার জীবনের কোনো স্মরণীয় ঘটনা বলুন।

উত্তর : মেয়েদের কাছে তাদের বাবারাই বোধহয় সব চাইতে আদর্শ পুরুষ হন। আমার চোখেও আমার বাবাই সব চাইতে বড়। তাই উনি যেদিন রাষ্ট্রপতি হলেন সেদিন আমার সব থেকে বেশি আনন্দ হয়েছিল। ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে বাবা যখন 'স্যালুট' নেন তখন আমার খুব আনন্দ হয়।

প্র : রাষ্ট্রপতিজি কীভাবে সময় কাটান, মানে ওঁর দৈনন্দিন রুটিন মোটামুটি কেমন ?

উত্তর : বাবা রোজ খুব ভোরে (ভোর পাঁচটা) ঘুম থেকে উঠে যোগব্যায়াম করেন এক ঘণ্টা। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ দই অথবা একটি কমলালেবু খেয়ে তবে এক কাপ চা খান (কারণ উনি খালি পেটে চা খান না)। তারপর স্নান করতে যান – স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট খান। এইসময় খবরের কাগজ পড়েন।

প্র : ওঁর দৈনন্দিন খাবার তালিকা কী ?

উত্তর : ব্রেক ফাস্ট (সময় সকাল ৮-৩০) – ভিজে ছোলা ও দই। লাঞ্চ (১-৩০ সময়) – ছোলার ছাতুর রুটি – ১ খানা, পছন্দমত দু-একটি সবজি (লাউ, বাঁধাকপি, ঢিঙা, মুলো, ফুলকপি ইত্যাদি), চিকেন এক টুকরো, দই। বিকেলে (৪ টার সময়) – ১ কাপ চা, সঙ্গে অল্প কিছু স্ন্যাক্স। ডিনার (৮-৩০ সময়) – লাঞ্চের মতনই। মোটামুটি এই রুটিন। বিকেলে রোজ ১ ঘণ্টা বাগানে বেড়ান। রাত্রি ১০টায় শুয়ে পড়েন তবে প্রায়ই অফিসিয়াল লাঞ্চ/ডিনার থাকে। তখন সময় ও খাওয়ার মেনু অন্যরকম হয়। আমার বাবা টকদই খুব পছন্দ করেন। বলেন, এতে শরীর খুব ভাল থাকে।

প্র : আপনার বাবা তো চিরকাল রাজনীতি করেছেন। মাঝে মাঝে জেলেও থেকেছেন, তখন আপনাদের দেখাশুনা কে করতেন ?

উত্তর : আমার মা-ই আমাদের দেখাশুনা করতেন। তবে ডাঃ নগেন্দ্র সিং নামে আমার বাবার এক বন্ধুও পুরোদায়িত্ব নিয়ে আমাদের দেখাশোনা করতেন। ওঁরই উৎসাহে আমরা দুই বোন ডাক্তার হয়েছি। অবশ্য আমার ল-পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা ছাড়তে হয়েছিল। ডাক্তার-আঙ্কল বলতেন, মেয়েদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া খুব দরকার – তবেই মেয়েরা সমাজে উপযুক্ত মর্যাদায় মাথা তুলে রাখতে পারবে।

প্র : ইন্দিরাজি সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ইন্দিরাজির মৃত্যু বজ্র-পতনের মতই আকস্মিক এবং ভয়ঙ্কর। আমি মনে করি, ওঁর মৃত্যুতে নারী জাতির খুব ক্ষতি হল। উনি মেয়েদের সমস্যা যেমন বুঝতেন, সেই সমস্যার যেভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করতেন, জানি না তেমন আন্তরিকভাবে এ ব্যাপারে বোঝার, জানার বা মোকাবিলা করার চেষ্টা কেউ করবেন কিনা। ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির এক গৌরবজনক অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পড়ল। এমন সময় দামী বোনচায়নার টি-সেটে করে চা-পাকোড়া এল। আমরা খেয়ে পিছনের গার্ডেনে (যেটাকে মোগল গার্ডেন বলা হয়) বেড়াতে লাগলাম। অজস্র ফুলের সমারোহ। সবুজ ঘাসের নরম লনে পা ডুবিয়ে ফোয়ারার ধারে ধারে কিছুক্ষণ বেড়ালাম। ওখানে লনে রাষ্ট্রপতিজি বসে ছিলেন। ওঁকে ঘিরে কিছু দর্শনার্থীও বসে আছেন। একটা চমৎকার হলুদ গোলাপের কুঁড়ি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। ছিঁড়ে নিয়ে ভাবলাম, খোঁপায় পরব। কিন্তু রাষ্ট্রপতিজি দেখে ফেলেছেন বলে লজ্জায় খোঁপায় না পরে ওঁর হাতে দিলাম, ভাবখানা যেন ওঁরই জন্যে তুলেছি। উনি খুব খুশি হলেন। শিশুর মতন সরল হাস্যে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আর একবার চা খেতে হল ওঁর সঙ্গে। ডাঃ মনজিতকে উনি একটু ঠাট্টাও করলেন। বললেন – দেখ, কৃষ্ণকলি আমার ইন্টারভিউ না নিয়ে তোমার নিল। তুমি তো দেখছি আমার থেকেও বেশি ইম্পর্টান্ট হয়ে গেলে। আমি ও ডাঃ মনজিত ওঁর বলার সরস ভঙ্গি খুব উপভোগ করলাম।

কৃষ্ণকলি



আজকের ফ্যাশন

এখনকার মেয়েদের প্রিয় পোশাক চুড়িদার-কামিজ। এর বৈচিত্র্যও অনেক। নানারকম কাজ-করা বা ফেব্রিক পেইন্টের কামিজ, তার সঙ্গে বাহারি ওড়না মন মাতায়। রুচিবদলের জন্য মাঝে মাঝে অন্য পোশাকও মন্দ লাগে না।

ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী
শ্রীমতী বিবি মুখার্জির সৌজন্যে



জীবনে গোপনীয়তা প্রয়োজন

ভারতী সাহা

সংস্কৃতে একটা কথা আছে যে, সত্য বল, প্রিয়ভাষী হও, অপ্রিয় সত্য কথা বোলো না। অপ্রিয় সত্য কথা হতে পারে, তবে, সেটা যদি অপরিহার্য না হয় তাহলে না বলাই ভাল।

যুগের পরিবর্তনের সংগে মানুষের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ সবই পালটে যায়। তাই 'পল্লীসমাজে'র রমা আর রমেশের প্রেম অনুক্ত থেকে গেছে, 'বড়দি'র প্রেম পাঠকের চোখে জল ঝরিয়েছে। বলা সম্ভব নয় বলেই ওদের প্রেম থেকেছে বোধের পর্যায়ে, গীতিময় এক অনুভূতি রসোত্তীর্ণ করেছে ওদের প্রেমকে। সামাজিক সভ্যতা, ভব্যতার খাতিরে শরৎচন্দ্র এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারেননি। তখনকার সমাজে শোভনতার জন্য গোপনীয়তা ছিল, আর গোপনীয়তার জন্যই রোমান্টিকতা এবং স্বর্গীয়তা ছিল ব্যক্তির জীবনে ও সমাজে। সব কিছু বলে ফেলা এখনকার সমাজের বাহাদুরি এবং চরম প্রগতির উদাহরণ হিসেবে ধরা হয় বলেই আজকের জীবনে রোমান্স কমে যাচ্ছে।

মানুষ একা বাঁচতে পারে না; নিজের স্বার্থের খাতিরেই সে সমাজ গড়েছে একদিন। অলিখিত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই যে সমাজ সে একদিন গড়ে তুলেছিল তাতে ছিল সমঝোতার আশ্বাস। আলেকজান্ডার সেলকার্কের নির্বাসিত জীবন আবার আজকে ফিরে এসেছে। আমাদের সত্য কথা অপ্রিয়ভাবে বলার ফলে নিজের নিজের আত্মীয়-বন্ধু-সন্তান এমনকি স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের কাছ থেকে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসিত।

অপ্রিয় সত্য বলাটাই আধুনিকতা। ছেলে বড় হলে সিগারেট খায়, মেয়ে বড় হলে স্বামী চায়, এটা বাস্তব সত্য। বাবা বা কাকাকে দেখে ছেলে যদি হাতের সিগারেট লুকোয়, বয়স্কদের উপস্থিতিতে মেয়ে যদি প্রেমিকের বক্ষোলগ্না হয়ে টুইস্ট না নাচে, তাতে জৈবিক রসে একটু ব্যাঘাত ঘটে ঠিকই, কিন্তু রোমান্টিকতা নষ্ট হয় না। জীবনে গভীর কিছু পেতে গেলে নীরব হতে হয়। সমুদ্রের কাছে বা পাহাড়ের কাছে মানুষ তাই একেবারে চুপ।

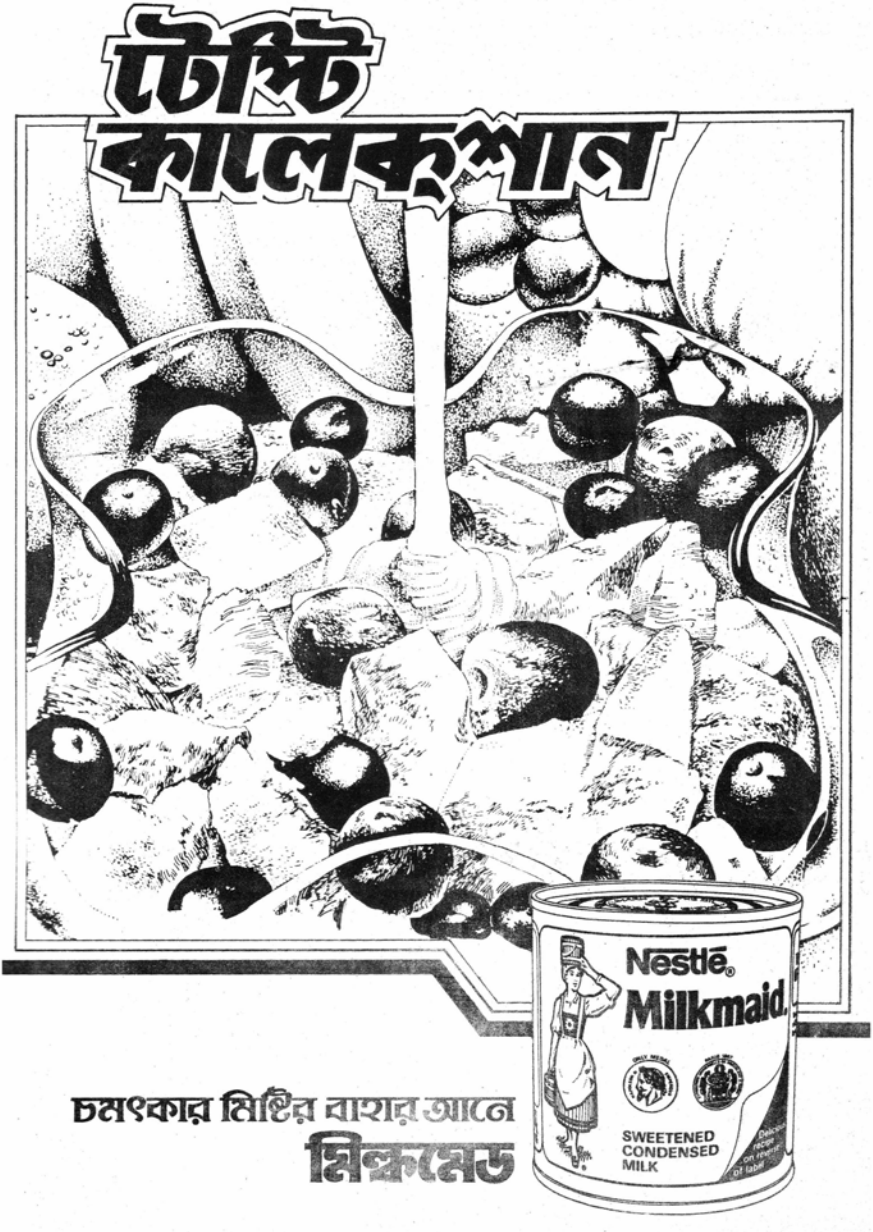
আজকের মানুষ প্রেম করে সরবে, সদর্পে। দুটো দেহের মধ্যে অজানা কি-ই বা আছে! কিন্তু মন! সে তো অতলান্ত। কোন বৈজ্ঞানিক, কোন অ্যানাটমিস্ট তর্জনী তুলে বলতে পারেন 'এই যে এটাই মন।' আসলে দেহের কোনো বিশেষ অংগপ্রত্যংগের অংগই তো নয় মন, সে দেহনিঃসৃত নির্যাস! সে যে গোপন ঘরের বাসিন্দা, তাকে খুঁজে পেতে হয়। আজকের প্রেম নিয়ে তাই মহাকাব্য হয় না।

মেয়েটির ঠোঁট দুটো ছিল কমলালেবুর কোয়ার মত, চোখ দুটিতে ছিল মহাকাব্যের আভাস, ভালবেসেছিল আপন পিসতুতো দিদির ছেলেকে। ছেলেটি ছোটখাট পুরনো সামাজিকতার দাম দিতে, অস্বীকার করতে পারেনি মাতৃঋণ। মেয়েটির ভালবাসা ছিল লজ্জাবতীলতার মত। ওদের জীবন নিয়ে মহাকাব্য হতে পারত। তা না হয়ে, হয়ে গেল নিরেট একটা আধুনিক গল্প। মেয়েটি যাকে বিয়ে করল সে প্রেম বোঝে না, কারণ আজকের জীবনে প্রেম নেই, রেফ্রিজারেটরের সাত দিনের রাখা মাছে পচন ধরে না ঠিকই, কিন্তু জীবনের সজীব উচ্ছ্বাস থাকে না। মেয়েটির স্বামী 'নষ্টনীড়ে'র চারুলতার মত স্ত্রী-র গোপন ব্যথা জেনে কাব্যের সুর বাজালো না। ঘুমন্ত স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালালো।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও বাবা-মা-ভাইবোন-আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে একটা সামাজিক পরিমণ্ডল থাকে। সেই পরিমণ্ডলের সকলকে নিয়েই কিছু না কিছু ভূমিকা দিয়ে যে কাহিনী, তা স্বভাবতই মুখরোচক। আজকের কাহিনী নায়ক-নায়িকা প্রধান। যারা জীবনের সব কিছুই করে অন্যকে সাক্ষী রেখে। ফলে একসংগে বসে তিন ঘণ্টার কোনো সিনেমাও দেখতে একঘেয়ে লাগে। বোনের বিয়েতে ছেলেটি তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল পি এফ থেকে। বউকে কিন্তু সে বলেনি। বউ জানত ননদ অফিস থেকে ধার নিয়েছে। ননদ নিতেও চেয়েছিল, তার দাদাই নিতে দেয়নি। বোনের বিয়ের পরও ছেলে পড়িয়ে, ওভারটাইম করে সে টাকার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছে। বউকে বললে কি হত! কি হত কে জানে! দাদা সে পথে যায়নি। বউদির আড়ালে দুই ভাইবোনের সেই গোপন মধুর সম্পর্ক বিরাট এক মহাকাব্য যেন!

রীতা নামের মেয়েটি সুনন্দকে চিনত তার ছোটবেলা থেকে একই পাড়াতে থাকত বলে। বড় হয়ে বিয়ের পর সুনন্দকে যখন নতুন করে চিনল তখন সে ক্যান্সারে ভুগছে। সুনন্দ যতদিন বেঁচে ছিল রীতা প্রতিদিনই তাকে দেখতে যেত, অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকটা সময়ই সে রেখে দিত সুনন্দর জন্যে। রীতার স্বামী সেটা জানত না। রীতা তাকে কোনোদিন বলেনি, এমনকি সুনন্দ মারা গেলেও না।

জীবনে এমন অনেক কথা, অনেক ব্যথা থাকে যা মানুষের একান্ত নিজস্ব। আসলে সব মানুষই কম বা বেশি নিজের কাছে একা। তার সেই একাকিত্ব, তার নিজস্ব ভাল লাগা, মন্দ লাগা, স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীন তার নিজস্ব মন, সে শুধু তারই। সে আর কারুর সংগে মেলে না, সেখানে সে সম্রাট।


টেস্টি
কালেকশান
Nestlé
Milkmaid
SWEETENED
CONDENSED
MILK
চমৎকার মিষ্টির বাহার আনে
মিল্কমেড











1

মিল্কমেড ভাঁপা কেক

6-8 জনের মতন

উপকরণ ঃ

200 গ্রাম ময়দা, ছোট 2 চামচ বেকিং পাউডার, 150 গ্রাম মাখন/ঘি, একটু নুন, 4 ডিম, $1\frac{1}{2}$ টিন মিল্কমেড, ছোট 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স।

প্রণালী ঃ

8 ইঞ্চির প্যানে হাল্কা ভাবে ঘি/মাখন লাগান। ময়দা, বেকিং পাউডার এবং নুন মিশিয়ে দুবার চেলে নিন। একটি বাটিতে মাখন নিয়ে হাল্কা ও মোলায়েম না হওয়া পর্যন্ত ফেটাতে থাকুন। একটি করে ডিম ভেঙ্গে মিলিয়ে দিন। প্রত্যেক বার ভাল করে ফেটাবেন। এখন এই মিশ্রণের সঙ্গে ধীরে ধীরে ময়দা মেলান। পাত্রে ঢেলে বেশী আঁচে 50 মিনিট ভাঁপিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে আরও 20 মিনিট রাখুন। ছুরি দিয়ে পরিস্কার কাটা গেলে বুঝবেন কেক্ তৈরী হয়ে গিয়েছে। নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন।

2

মিল্কমেড দিয়ে নারকোলের নাড়ু

6-8 জনের মতন

উপকরণ ঃ

250 গ্রাম নারকেল পাউডার, 1 টিন মিল্কমেড।

প্রণালী ঃ

50 গ্রাম নারকেল পাউডার আলাদা করে রাখুন।

নারকেলের বাকী পাউডার মিল্কমেডের সঙ্গে মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে দিন এবং কড়াই-এর গা থেকে ছেড়ে না আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন এবং হাতে ঘি বা মাখন লাগিয়ে ছোট ছোট নাড়ু বানান। এবার আলাদা রাখা নারকেল পাউডার নাড়ুর গায়ে মাখিয়ে দিন।

3

বিনা ডিমের মিল্কমেড কেক

10-12 জনের মতন

উপকরণ ঃ

2 কাপ ময়দা, 1 1/4 কাপ মাখন অথবা ঘি, 1 টিন মিল্কমেড, 1 কাপ জল, 1/2 ছোট চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, একটু নুন, $\frac{3}{4}$ ছোট চামচ বেকিং পাউডার, 1 কাপ বাদাম কুচি।

প্রণালী ঃ

মাখন ভালভাবে ফেটিয়ে নিন। একটি পাত্রে মিল্কমেড, ফেটানো মাখন, জল, বাদাম কুচি মিশিয়ে উথলে ওঠা পর্যন্ত আঁচে রাখুন। নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন।

এবার ময়দা, বেকিং পাউডার আর নুন মিশিয়ে চেলে নিন। মিল্কমেড এবং বাদাম কুচির মিশ্রণ দিয়ে ভালভাবে ফেটান। ভ্যানিলা সুগন্ধি মিশিয়ে মাখন লাগানো 8 ইঞ্চির কেক টিনে ঢেলে 150 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে 1 1/2 ঘণ্টা বেক্ করুন। ইচ্ছে করলে মিল্কমেডএ চকোলেট, লেবু অথবা কমলা লেবুর ফ্লেভার দিয়ে এই কেক সাজাতে পারেন।

4

মিল্কমেড সেমুই

4 জনের মতন

উপকরণ ঃ

1 টিন মিল্কমেড, 50 গ্রাম সেমুই, 1/2 কাপ কিসমিশ এবং বাদাম কুচি (ইচ্ছা মতন), 2 কাপ দুধ, 2 বড় চামচ মাখন।

প্রণালী ঃ

সেমুই, মাখনে হাল্কা বাদামী রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। দুধ ও মিল্কমেড মিশিয়ে বেশ ঘন না হওয়া পর্যন্ত আঁচে রাখুন। কিসমিশ এবং বাদাম কুচি ওপরে সাজিয়ে গরম অথবা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।

5

মিল্কমেড ফিরণী

5 জনের মতন

উপকরণ ঃ

1 টিন মিল্কমেড, 3/4 লিটার দুধ, 100 গ্রাম চাল, 1/2 ছোট চামচ কেওড়া এসেন্স, বাদাম কুচি এবং রূপালী রাংতার তবক (ইচ্ছা মতন)

প্রণালী ঃ

চাল ধুয়ে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সামান্য জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। মিল্কমেডের সঙ্গে দুধ আর চাল বাটা মিশিয়ে আঁচে ফুটতে দিন। পরে আঁচ কমিয়ে ঘন না হওয়া পর্যন্ত অনবরত নাড়তে থাকুন।

ঠাণ্ডা হতে দিন এবং কেওড়া সুগন্ধি দিয়ে একটি থালায় ঢেলে দিন।

জমে যাবার জন্য কিছুক্ষণ রাখুন এবং বাদাম কুচি আর রূপালী তবক দিয়ে সাজান।

মিল্কমেড লেমন সুফ্লে

4 জনের মতন

উপকরণ ঃ

2 লেবু, 3 ডিম (হলুদ ও সাদা অংশ আলাদা), 1/2 কাপ চিনি, 2 ছোট চামচ জিলেটিন, 1/2 টিন মিল্কমেড, সাজাবার জন্য কিছু চেরী ফল।

প্রণালী ঃ

লেবুর রস বের করে নিন এবং একটি লেবুর খোসা মিহি করে কুরে ফেলুন। রস, কুরে নেওয়া খোসা, ডিমের হলুদ অংশ আর চিনি একটি কানা উঁচু পাত্রে ঢেলে, গরম জলের একটি পাত্রের ওপর বসিয়ে ঘন না হওয়া পর্যন্ত ফেটাতে থাকুন। 1/2 কাপ গরম জলে জিলেটিন গুলে লেবুর রস, মিল্কমেডের সঙ্গে মিশিয়ে ঘন না হওয়া পর্যন্ত ফেটিয়ে যান। ডিমের সাদা অংশও ভাল ক'রে ফেটিয়ে এই মিশ্রণের ওপর ঢেলে দিন। এবার একটি থালায় রেখে ফ্রিজে জমতে দিন।

শ্রাবন্তীর কলম



সেদিন ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। অথচ বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। খাটের পাশেই রাখা ছিল এক রাশ খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। অনেক রাত পর্যন্ত ওগুলো পড়েছি। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিল না। সকালে উঠেই ওগুলোর দিকে চোখ যেতেই হঠাৎই মনে হল, পৃথিবীতে, বিভিন্ন জায়গায় যা কিছু ঘটছে তার বেশিরভাগ ব্যাপারেরই মূলে যেন রয়েছে আমেরিকা বা কোন আমেরিকান। ওরা অদ্ভুত একটা পাগল জাত – সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। ব্যক্তিগতভাবেও – আবার জাতি হিসেবেও। কয়েকটি উদাহরণ দেব আজ এই কলমে।

প্রথম চলুন জাপানে। বিদেশী জিনিস আমরা প্রচণ্ড ভালবাসি। বিশেষ করে জাপানী। আমরা পাগলের মত কিনি ব্যবহার করা বিদেশী জামাকাপড় ইত্যাদি। বিভিন্ন মঞ্চে, কাগজে, রেডিওতে শুনি এবং পড়ি, সত্যিকারের ভারতীয় হন, ভারতীয় জিনিস কিনুন। Britain-এ যদি যান, শুনবেন, 'Be British, buy British!' ফ্রান্সে গেলেও শুনবেন এই ধরনেরই কথা। তবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন জাপানের Prime Minister ইয়াসুহিরো নাকাসোনে। টেলিভিশনে তিনি জাপানীদের বলেছেন, 'বিদেশী মাল কেনো, আমেরিকান মাল কেনো'। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ব্যাপার এই বোধহয় প্রথম। ব্যাপারটার মূলে কিন্তু আমেরিকা।

এবার চলুন আফ্রিকায়। ইথিওপিয়ার কথাই অবশ্য আগে মনে পড়বে। সেখানে নাকি দারুণ দুর্ভিক্ষ। তবে দুর্ভিক্ষ কথাটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন নয় – বরং এত পুরনো যে এই ধরনের কথা শুনলে আমাদের মনে বোধহয় খুব দাগ কাটে না। কিন্তু আমেরিকায় এই ব্যাপারে প্রচুর আলোড়ন দেখা গেছে। আমি নিজে একজন শিল্পী। তাই শিল্পীদের এই ব্যাপারে সাহায্য করবার একটা প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

একদিন, Harry Bela Fonte, টেলিভিশনে, একজন অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তারকে মুমূর্ষু-ক্ষুধার্ত একটি ইথিওপিয়ার শিশুকে সেবা করতে দেখেন। আর হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ ঘিরে রয়েছে ডাক্তারকে। এই দৃশ্য দেখে উনি এতই moved হয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে যোগাযোগ করেন নামকরা সংগীত শিল্পীদের, যেমন মাইকেল জ্যাকসন, লায়নিল রিচি, ডায়ানা রস, স্টিভি ওয়ান্ডার, রে চার্লস, সিন্ডি লওপার, কেনি রজার্স.....। সবাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ঠিক করলেন সবাই, ইথিওপিয়ার এই মানুষদের সাহায্য করবেন তাঁরা। কেউ পয়সা নেবেন না। ফলে গত জানুয়ারির শেষে সৃষ্টি হল একটি record— 'We are the world'. গানের কথা মাইকেল জ্যাকসন এবং লায়নিল রিচির। রেকর্ডে গেয়েছেন পঁয়তাল্লিশজন শিল্পী।

record-টি দোকানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেসের মাত্র একটি দোকান থেকে দুদিনে বিক্রি হল এক হাজার রেকর্ড। আশা করা যাচ্ছে রেকর্ড বিক্রি করে ৫০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে কি হবে! এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লাগবে এই বছরেই আফ্রিকার লোকদের শুধু খাবার যোগাতে।

বলেছি যে, ওরা যা করে ভালো করেই করে। যাতে এই প্রচেষ্টা সত্যিই সফল হয়, কেউ যেন একটা দুটো record না কিনে এক সঙ্গে চার-পাঁচখানা কেনে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে দেয় একটাই শর্তে, তারাও যেন চার-পাঁচখানা record কিনে অন্যদেরও উপহার দেয়।

এই ধরনের ঘটনা আমেরিকাতেই সম্ভব।

এবারে চলুন মহাশক্তিশালী ডলারের ব্যাপারে। ডলার পুজো ঘটা করে পুরুত ডেকে হয়তো কেউ করে না। তবে ডলারের প্রভাব জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুনিয়াতে এখন প্রচণ্ড। সেই সুযোগ নিয়ে আমেরিকানরা পৃথিবী কিনতে বেরিয়েছে। অবশ্য কেনার অভ্যেসটা ওদের একটু অদ্ভুত – অবিশ্বাস্য। বেচার চংটাও সমান চমকপ্রদ।

আমার প্রায়ই তাই মনে হয়, একটু যদি সরকারি সাহায্য বা সুবিধে পেতাম, তাহলে বছর দুয়েক আগে 'গান্ধী' ছবি যখন পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল, সেই সময় 'গান্ধী' লাঠি ওখানে বেচতে পারতাম। আজ তাহলে হলিউডে মিলিয়ন ডলারের একটা বাড়ি হত আমার। আমার বিজ্ঞাপনে Product Promotion হত গান্ধী লাঠি হাতে থাকবে, আণবিক যুদ্ধ দূরে পালাবে। এমনই নাকি দেশ আমেরিকা, যেখানে ঠিকমত মার্কেটিং করতে পারলে 'পেটরক' অর্থাৎ পোষা পাথরও নাকি বিক্রি করা যায়। একজন মার্কেটিং স্পেশালিস্ট বলেছিলেন – কুকুর, বেড়াল তো লোকে পোষবার জন্যে বিক্রি করতে পারে। আমি বাজি রেখে পোষবার জন্যে পাথর বিক্রি করে দেখিয়ে দেবো। তারপর নাকি লোকের হাতে হাতে দেখা গেল পোষা পাথর। এই গল্প যে সত্যি, এমন প্রমাণ অবশ্য আমার কাছে নেই।

এহেন আমেরিকানরা বেরিয়ে পড়েছে দেশভ্রমণে। উদ্দেশ্য –এক নম্বর – পৃথিবী কিনবো সস্তায়, দু নম্বর – ডলারের টাকায় দেশ দেখবো। ফল হল, প্লেনে জায়গা নেই দিনের পর দিন, হোটেলও তাই! প্রত্যেক বছরেই দেশভ্রমণে ওরা বেরোয় ঠিকই – কিন্তু এমন ভাবে নয়। মাত্রাটা এতো বেশি, কারণ ডলারের দাম বাড়ায় বিদেশে জিনিস সস্তা হয়েছে। কম ডলার দিয়ে বেশি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে নাকি এক সন্ধ্যায় কনকর্ড প্লেনে লন্ডনে গিয়ে জিনিস কিনে তার পরদিন সন্ধেয় দেশে ফিরছে। তাতে নাকি বেশ লাভ। আর একটা উদাহরণ না দিলে আমার কলম সম্পূর্ণ হবে না। এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা ফ্রান্স থেকে একটা ফার কোট কিনেছেন রাশিয়ান লিকুলেসর। দাম ৩০৩,০০০.০০ ডলার। টাকায় যত হয় তা যদি জানতে চান, মোটামুটি সাড়ে বারো টাকা দিয়ে গুণ করে নিন। অঙ্কে আমি চিরকালই কাঁচা, বিশেষ করে টাকার অঙ্কতে। আমি শেষের শূন্যগুলোতে সবসময়ই হারিয়ে যাই।

দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু ভদ্রমহিলার নামটা পাওয়া যায়নি। নাম দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কেন!

আমাদের দেশে হলে বলতাম Income Tax-এর ভয়। ওদের ব্যাপারে তা বোধহয় নয়। আমাদের দেশে যেমন প্রায় কেউই ঠিক ঠিক Income Tax দেয় না, ওদের দেশে কিন্তু তার ঠিক উল্টো, তাহলে নামটা জানাতে আপত্তি কেন! লাখ লাখ টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনে তা যদি উঁচু গলায় সবাইকে না জানানো গেল তাহলে আর জিনিস কেনার সার্থকতা কোথায়? তবে কি ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছিলেন যে বড়লোকামির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ব্যাপারটা তখন কুৎসিত বা ভালগার হয়ে যায়। নাকি হঠাৎ আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়ায় তাঁর লজ্জা হয়েছিল। মনে হয়েছিল ব্যাপারটা কেমন যেন হৃদয়হীন! আমার মনে হয় যারা এত দাম দিয়ে জিনিস কেনে তাদের হৃদয় নামক বস্তুটি আছে কিনা সন্দেহ। অন্তত মানুষের হৃদয়, রক্ত মাংসের হৃদয়!

হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড যে রক্ত মাংস ছাড়াও হয়, সেটাই এবার বলব। চলুন সুইডেনে, আলাপ করিয়ে দি, রবার্ট জারভিক-এর সঙ্গে। রবার্ট জারভিক কলের হৃদয় তৈরি করেছেন। নাম জারভিক সেভেন। মানুষের রক্ত মাংসের হৃদয় কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় কলের হৃদয় তিনি বসাচ্ছেন। বুকের মধ্যে এই যন্ত্রচালিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে মানুষ কিছুদিন বেঁচেও থাকছে। ভুল করবেন না এটা কিন্তু পেসমেকার নয়। সম্পূর্ণ একটা আলাদা যন্ত্রচালিত হৃদয়। আবিষ্কারক ডঃ জারভিক, জাতে আমেরিকান।

এবারে বলব সুইডেনের স্টেনবার্গ-এর কথা। ইনি চতুর্থ মানুষ, যার বুকে জারভিক সেভেন লাগানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত, মানে আমার এই কলম লেখা পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। লিফ্ স্টেনবার্গ কিন্তু সাধারণ একজন সুইডিশ নন, ইনি সুইডিশ মাফিয়ার ডন। পুলিশরা তাঁর বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। ১৯৭৮ সাল থেকে ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঝুলছে। বয়েস ৫২ এবং দুটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ায় অভিযোগ, আর এগোনো যায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা এখন আরো জটিল হয়েছে। লিফের বিরুদ্ধে এখন কিছু করা যাবে না বলেই অনেক আইনজীবী মনে করেন। কারণ? সুইডেনে মানুষের হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেলেই আইনত সে মৃত। যদিও লিফ্ জীবিত – যদিও তার রক্ত মাংসের হৃদয়-স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে, সে এখন আইনত মৃত। মৃত মানুষকে তো আর আইনের আওতায় আনা যায় না!

বিজ্ঞান আমাদের চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে, যন্ত্রের হৃদয়ও দিয়েছে! তার সঙ্গে জীবনও জটিল হয়েছে, আরো হবে। এবার সেই জীবন চালনার জন্য প্রয়োজন নতুন আইন কানুন! প্রশ্ন হল, সেই আইন লিখবে কে বা কারা!! রক্ত মাংসের হৃদয় যে মানুষের, তার বা তাদের লেখা আইন কানুন তারা কি মানবে যাদের হৃদয় – যন্ত্রের??

শ্রাবন্তী মজুমদার

ছোটদের স্কুল ব্যাগ



দেখতে দেখতে বছরের চার মাস কেটে গেল। কিছু স্কুলের নতুন ক্লাস শুরু হবে। কিছু স্কুলের অর্ধেক হল। এরপরই গরমের ছুটি। যাদের নতুন ক্লাস, তাদের নতুন বই, ইউনিফর্ম ইত্যাদি চাই। যাদের অর্ধেক হল তাদেরও কিছু নতুন জিনিস হলেই ভাল হয়। অনেকদিন পরে স্কুল যাওয়ার সময় নতুন কিছু পেলে ভালই লাগে। স্কুল যাওয়ার সরঞ্জামের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হল বই-এর ব্যাগ। তাই এ বারে একটি ব্যাগই তৈরি করে ফেলুন। ব্যাগটি ছেলে বা মেয়ে সকলেই ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া যা সব বই-এর বহর! তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিসও থাকে। সেজন্য ব্যাগ বেশ শক্ত ও বড়ও চাই। সামনেই ছুটি সুতরাং হাতে কিছু সময়ও পাওয়া যাবে তৈরি করার জন্য।

এর জন্য দরকার হবে বড় বহরের আধগজ ডেনিম বা জীনস-এর কাপড়। তাছাড়া ছোট ছোট লাল, হলদে ও সবুজ রঙের কয়েকটি কাপড়ের টুকরো, তার সঙ্গে মানানসই সুতো।

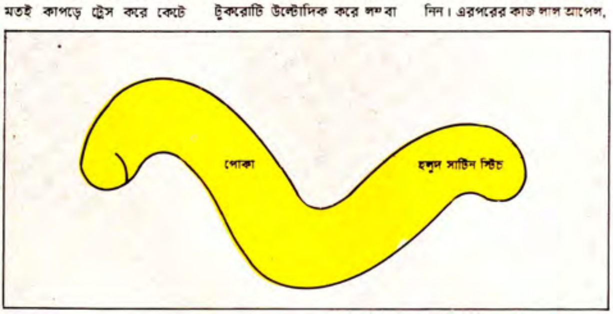
প্রস্তুত প্রণালী ঃ ডেনিম কাপড়ের থেকে ১৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১৯ ইঞ্চি চওড়া দুটি টুকরো কেটে নিন এবং সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া ও ১৪ ইঞ্চি লম্বা একটি টুকরো কেটে নিন হ্যাণ্ডেলের জন্য। ছবি অনুযায়ী অ্যাপ্লিকের রঙিন টুকরোগুলিও কেটে নিন। ছবিতে যে মাপ দেওয়া আছে সেই মাপ মতই কাপড়ে ট্রেস করে কেটে নিন। কেবল আপেলের জন্য কাপড়টি দু ভাঁজ করে এক ভাঁজে এঁকে নিন ও ওই অনুযায়ী কেটে খুলে নিলেই গোটা আপেল হয়ে যাবে।

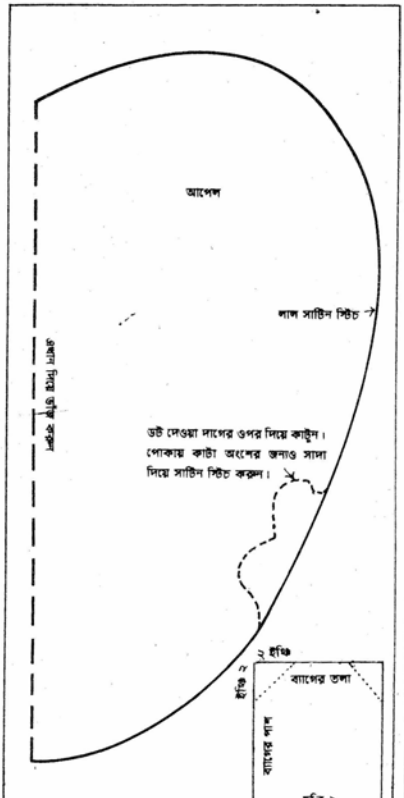
এবারে হ্যাণ্ডেলের কাপড়ের টুকরোটি উল্টোদিক করে লম্বা বরাবর সমান দু ভাঁজ করুন। বাইরের ধারটি থেকে আধ ইঞ্চি ছেড়ে সেলাই করুন। তারপর উল্টে নিয়ে ইস্ত্রি করে নিন।

এবারে দু ধারেই একটু ছেড়ে আবার ওপর দিয়ে সেলাই করে নিন। এরপরের কাজ লাল আপেল, সবুজ পাতা ও হলদে পোকা ব্যাগের সামনের খণ্ডে ঠিক করে সাজান ও টেকে নিন অথবা পিন দিয়ে আটকে নিন। এর জন্য অবশ্য ঐ খণ্ডেও এঁকে নিতে পারেন জিনিসগুলি, তাহলে সাজাতে সুবিধে হয়। যাইহোক টেকা হয়ে গেলে সাটিন স্টিচ বা ডরাট সেলাই দিয়ে আপেল ইত্যাদির চারধার সেলাই করুন।

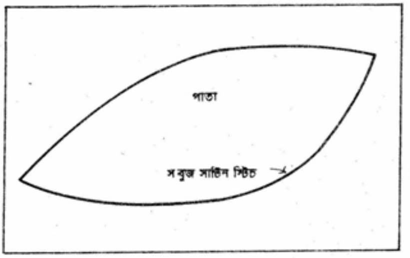
পোকার জন্য হলুদ, আপেলের জন্য লাল, পাতার জন্য সবুজ সুতো ব্যবহার করুন। কেবল আপেলের কাটা অংশটুকু সাদা সুতো দিয়ে ও ডাঁটি নীল সুতো দিয়ে, সাটিন স্টিচ দিয়েই সেলাই হবে।

পোকার চোখ ও মুখ কালো সুতো দিয়ে করে নিন। মুখে স্টেম স্টিচ বা ডাল সেলাই হবে।





ছবি ১

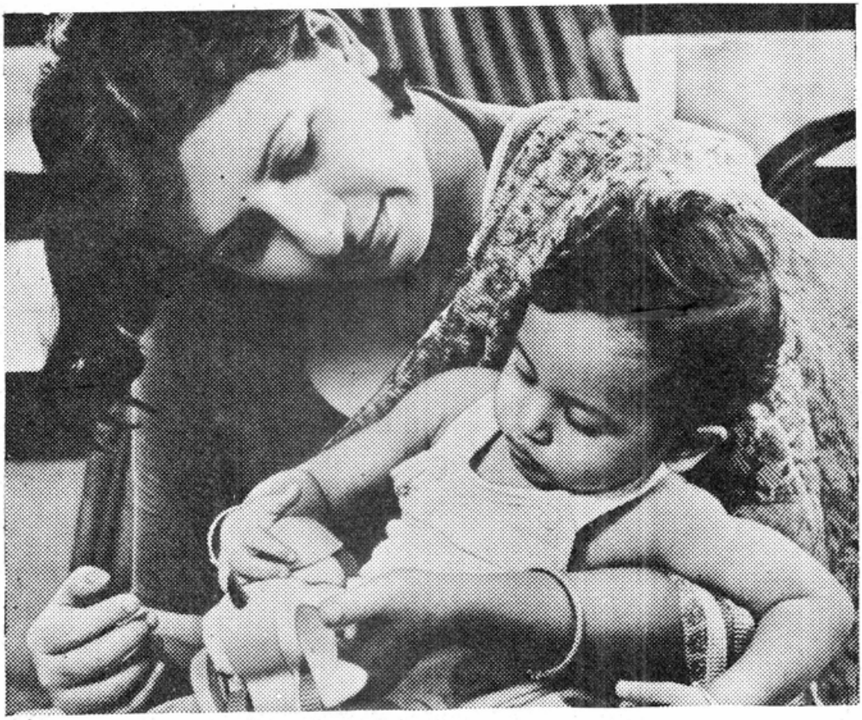


অ্যাপ্লিকের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে দুই খণ্ডকেই উল্টো করে ধরে ১৬ ইঞ্চির দিক দুটি বরাবর সেলাই করুন। অর্থাৎ ব্যাগের দুপাশ জোড়া হয়ে গেল। আবার সোজা দিক করে, ওপর দিয়ে, জোড়ার মুখ থেকে একের চার ইঞ্চি বাদ দিয়ে দুপাশেই মেশিন চালান। এবারে ব্যাগকে উল্টে দিয়ে অর্থাৎ উল্টোদিক করে তলার দিকটা জুড়ে নিন। এখন আপনার ব্যাগটির তলা যাতে বসানো যায় তার জন্য একটা কাজ করতে হবে। কাজটি হল ব্যাগের তলার এবং পাশের জোড়ার একেবারে কোণের দিক থেকে লম্বা দিকে ২ ইঞ্চি ও চওড়ার দিকে ২ ইঞ্চি (দুটি খণ্ডের মিলিত বিন্দু থেকে) যেখানে যেখানে হবে সেই বিন্দু দুটিকে মেলালে অথবা বলা যায় সেই বরাবর ভাঁজ করলে একটি ত্রিভুজের মত হয়। আপনার কাজ হল ঐ ভাঁজ বরাবর সেলাই করা। এর জন্য সবচেয়ে ভাল হয় তলার দিকে যেখানে ২ ইঞ্চি হয় সেখান থেকে পাশের দিকে যেখানে ২ ইঞ্চি হয় সে পর্যন্ত একটি দাগ টেনে নেওয়া ব্যাগের উল্টো দিকে। কারণ সেলাইও উল্টো দিকেই হবে। এরকম দুপাশেই হবে। এতে ব্যাগের তলাটা বেশ ছড়ানো হবে অথচ বসবে। জিনিস রাখতেও তাতে সুবিধা হয়। কোণের সেলাইয়ের জন্য ছবি ১ দেখুন।

এখন আরও একটি কাজ বাকি থাকল। সেটি হল ব্যাগের সোজা দিকে একেবারে ওপর থেকে আরম্ভ করে এক পাশ ধরে নেমে, তলা বরাবর গিয়ে আবার আরেক পাশের ওপর পর্যন্ত, জোড়ার সেলাইগুলি থেকে ২ ইঞ্চি বাদ দিয়ে একটি দাগ টেনে নিন। এরকম সামনে পেছন দুদিকেই দাগ টানুন। তারপর এই দাগ বরাবর ব্যাগকে ভাঁজ করুন। এই ভাঁজের একেবারে কাছাকাছি দিয়ে চারধারে (ওপর থেকে নিচ ও নিচ থেকে ওপর) মেশিন চালান। এই সেলাই যেন অবশ্যই সোজা দিকের ওপর দিয়ে হয়। এতে ব্যাগটি বেশ চৌকো আকার (বাক্সের মত) নেবে। সব শেষে একেবারে ওপরের খোলা দিকে ১ ইঞ্চি করে ধার মুড়ে নিন ও হ্যান্ডেলটি ঠিক মাঝামাঝি করে বসিয়ে নিন।

এবার দেখুন কী চমৎকার অথচ কী মজবুত ব্যাগ তৈরি হয়ে গেল। এটি উপহার হিসেবেও খুব বাহারী ও কাজের হয়। চুপিচুপি বানিয়ে ছেলেমেয়েদের চমকেও দিতে পারেন আবার তাদের পছন্দ মতো অ্যাপ্লিকের ডিজাইনও করতে পারেন।

পুতুল খান্না



পিয়ারলেসের মাধ্যমে আপনার সঞ্চয় মানেই তা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কারণ আপনার কষ্টার্জিত টাকার ওপর পিয়ারলেস কোনো ঝুঁকি নেয় না।

আপনি পিয়ারলেসের মাধ্যমে যা সঞ্চয় করেন, সেই টাকার সবটাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ও অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটিতে স্থায়ী আমানতরূপে সরকারের কাছেই বিনিয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিয়ে একমাত্র সার্টিফিকেট-হোল্ডারদের ফেরত দিতেই ওই টাকা তোলা যায়, অন্য কোনো কারণেই নয়। সঞ্চিত টাকার এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্যই পিয়ারলেস আর সব নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একেবারে আলাদা। কারণ এই ধরনের আর কোনো কোম্পানীই সঞ্চয়কারীদের টাকার ওপর একেবারে শতকরা একশ ভাগ নিরপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

পিয়ারলেসের এই অভাবনীয় সাফল্যের গোপন শক্তি কোথায়? বলা বাহুল্য, ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পিয়ারলেসের অনন্য সমাজ কল্যাণ প্রকল্পই এই সাফল্যের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানসম্মত ও এ্যাক্চুরিয়াল পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত এই সঞ্চয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, স্বল্প-আয়ের মানুষদের সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। এই কাজে নিবেদিত কর্মীদের সুগঠিত টীম সারা দেশে, এমন কি সুদূর গ্রামে গ্রামান্তরে, অজ পাড়াগাঁয়েও তাদের কাজ সংগঠিত করছেন—আর তাই বছরের পর বছর এই প্রকল্প জনসাধারণের কাছে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আজ প্রতি ৫০ জন ভারতীয়ের একজন পিয়ারলেস সার্টিফিকেট-হোলডার—যা ভারতের বৃহত্তম নন ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনসাধারণের পূর্ণ আস্থার প্রমাণ।

সরকারী হেফাজতে মোট বিনিয়োগ ৫০০ কোটি টাকারও বেশি।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং লিঃ

পিয়ারলেস ভবন,
৩ এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

PGI-5724

শিশুমনের চাহিদা

১৬ – ৩১ মার্চ সংখ্যা থেকে ডক্টর সুখময় সেনগুপ্তের 'আপনার সন্তান' ধারাবাহিক রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই রচনার দ্বিতীয় কিস্তি 'বংশধারা ও পরিবেশ' এবং তৃতীয় কিস্তি 'শিশুর প্রথম বছর' ছাপা হয়েছে যথাক্রমে ১ – ১৫ এপ্রিল এবং ১৬ – ৩০ এপ্রিল সংখ্যায়। বর্তমান সংখ্যায় রচনাটির চতুর্থ কিস্তি ছাপা হল।



শিশু চায় স্নেহ

সন্তান যাঁরা লালনপালন করছেন, সন্তানের মনের পরিচয় তাঁদের ভালো করে জানা দরকার। শিশুর সহজাত আকাঙ্ক্ষা তথা প্রবৃত্তিগুলি কি? সেগুলির চরিতার্থতার জন্য সে ব্যাকুল – এ সম্বন্ধে অভিভাবকের বোধ ও সচেতনতা থাকলে, তাঁর পক্ষে সন্তানপালন সহজ হয়ে ওঠে। আবার এগুলি চরিতার্থ না হলে শিশুর সুখশান্তি এবং ব্যক্তিত্বের শোভন বিকাশ হয় না।

স্নেহ

শিশু চায় অফুরন্ত স্নেহ। জীবন-শুরুতে এ স্নেহের আধার হচ্ছেন মা। মায়ের স্নেহের পরেই আসছে শিশুর ছোট্ট পরিবেশে তার বাবা, ভাইবোন প্রভৃতির স্নেহ। শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্য মায়ের স্নেহ তথা বাবা, ভাইবোনদের স্নেহ একান্ত প্রয়োজন। মনস্তত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন, যে শিশুরা শৈশব বা বাল্যে বাবা, মা হারিয়েছে অথবা অনাদৃত কিংবা পরিত্যক্ত, তাদের পক্ষে সুস্থ মন নিয়ে গড়ে ওঠা কষ্টকর হয়। ছেলেবেলায় স্নেহের অভাবেই তারা নিষ্ঠুর, সন্দেহপরায়ণ, উগ্র, কলহপরায়ণ হতে পারে। অনেকে আবার একটা ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি নিয়ে চলে। এইসব শিশু মানুষের সঙ্গ পরিহার করে আপন মনে থাকতে চায়। কিন্তু এই সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, স্নেহের অতিশয্যও ক্ষতিকর। সব সময় স্নেহ পেতে পেতে শিশু এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়ার সকলের কাছে সে স্নেহের প্রত্যাশা করে বসে। কোথাও স্নেহ থেকে সামান্য বঞ্চিত হলেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিমিত স্নেহ যেমন সহায়তা করে, অপরিমিত স্নেহ তেমনি সন্তানকে অপদার্থ ননির পুতুল করে গড়ে তোলে।

স্বাধীনতা

শিশুর জীবনের আর একটি মৌল চাহিদা হচ্ছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কয়েকমাস বয়স হলেই শিশু ব্যক্ত করতে শুরু করে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খাওয়ালে, ঘুম পাড়ালে, জামা জুতো পরালে সে চিৎকার করে তার প্রতিবাদ করে। তার অনিচ্ছায় তার প্রতি কোনো আচরণ করা হলে সে কান্নাকাটি করে। সবাইকে অস্থির করে তোলে। পুরো শৈশবটা শিশু তার এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে জানাতে থাকে। হাঁটিতে, চলতে, দৌড়তে শিখে সে কাদা, জল ঘাঁটিতে চায়। বৃষ্টিতে ভিজতে চায়। খালি পায়ে চলতে চায়। নিজের হাতে খেতে চায়। আরো কত কী! এইসব অবস্থায় তাকে শাসন করতে হয় সাবধানে। পিতামাতার আশা করা উচিত নয়, শিশু সব সময় শান্তশিষ্ট হয়ে যন্ত্রের মত তাঁদের কথা শুনে চলবে।

শিশুকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলাই পিতামাতার কাজ। তাই শাসন করবার সময় মনে রাখতে হবে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাও যেন যতটা সম্ভব বজায় থাকে। তার স্বাধীনতায় আঘাত না করে তার ইচ্ছাটিকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে শিশু রুষ্ট হয় না। তার স্বাধীনতা আহত হল ভেবে সে ক্ষুণ্ণ হয় না।

শিশুপালনে সত্যিকারের অসুবিধার সৃষ্টি হয় বড়দের সব সময় একটা বড়ত্বের মনোভাবের জন্য। যে-মনোভাব নিয়ে তাঁরা শিশুর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার বা শ্রদ্ধা করতে পারেন না। কিন্তু শিশুরা প্রচণ্ডভাবে আত্মসচেতন। তারা স্বীকৃতি পেতে চায়। কোনমতেই মেনে নিতে চায় না, তারা ছোট, তারা শিশু। কেউ বোঝালেও তা বুঝতে চায় না।

সন্তানের স্বাধীনতার বিষয়টা যদি তার শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত সাজিয়ে ভাবতে চাই, তাহলে এ সম্পর্কে কিছু খবর রবীন্দ্র-জীবন থেকে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি'তে (হিমালয় যাত্রা অধ্যায়) বলেছেন, 'এক একদিন দুপুরবেলায় লাঠি হাতে একলা (রবীন্দ্রনাথের এ সময়ে বয়স এগার-বার) এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম, পিতা তাহাতে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিয়াছি,– তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন।'

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ আরও এক জায়গায় বলেছেন, 'শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালোমন্দের মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই......

স্বীকৃতি

স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজীবন প্রত্যেকের সঙ্গে চলে। সকলে জীবনের নানা পর্যায়ে খেলাধূলা করে, পড়াশুনা করে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় করে, প্রমাণ করতে চায় অপরের চেয়ে

সে বেশি আদরণীয়, বেশি গুণবান। ছেলেবেলায় নিজের এই গুরুত্ব প্রমাণ করবার জন্য শিশুর অন্তরে একটি বিশেষ চাহিদা আছে। সে চাহিদা পূরণ হওয়া দরকার। অর্থাৎ যখন সে একটি ছড়া ভাল করে বলে, একটি গান গায় বা আবৃত্তি করে, একটি ছবি আঁকে তখন তাঁকে প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসা থেকেই সে তার নিজের মূল্য ও যোগ্যতা উপলব্ধি করবে। এতে তার চিত্ত তৃপ্ত হবে। এই প্রশংসা-টনিক ব্যবহার করে সন্তানকে কৃতিত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখানেও পরিমিতিবোধ প্রয়োজন। কেননা প্রশংসার বাড়াবাড়ি শিশুকে অহঙ্কারী করে তোলে, তার আত্মচেষ্টায় শৈথিল্য আনে এবং উৎকর্ষলাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

কৌতূহল নিবৃত্তি

কৌতূহল আমাদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কৌতূহল জন্মগত প্রবৃত্তি বলেই আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারি, ক্লান্তি আসে না। কৌতূহল যার নেই, তার জীবন তো স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে। তার আর অগ্রগতি নেই। তাই সন্তানের কৌতূহলে অভিভাবকদের বিরক্তি বোধ করতে নেই। শিশুর পাকামো ভেবে শিশুকে হতাদর করতে নেই। যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হয়ে শিশুর কৌতূহল মেটাতে হয়। ফলে শিশু একদিকে যেমন তৃপ্ত হয়, অপরদিকে তার কৌতূহলের পরিধি বাড়ে এবং জ্ঞানলাভ হয়। যে কৌতূহল চরিতার্থ হলে শিশুর জ্ঞান বাড়বে, সে জীবনাদর্শের সন্ধান পাবে, সেইসব কৌতূহলই মেটাতে হবে। কিন্তু যে কৌতূহল ভব্যতা, শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে, সে-কৌতূহল যে অশোভন, একথাও তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সঞ্চয়ন

শিশুর আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। ছেলেমেয়েরা কত রকমের খেলনা, ছবি, প্রজাপতির পাখনা, মার্বেল প্রভৃতি সঞ্চয় করে অপার আনন্দ পায়। শিশুর এই সঞ্চয় বা সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষাতে বাধা দিতে নেই। বরং প্রশ্রয় দিতে হয়। শিশুর সঞ্চিত জিনিস জঞ্জাল নয়, এগুলি



সমবয়সীর সঙ্গ

তার অহংবোধকে তৃপ্ত দেয়। প্রিয়জনদের, বন্ধুদের এসব দেখিয়ে সে বাহাদুরি নিতে চায়। এই সঞ্চয়ের ব্যাপারে অভিভাবক যদি শিশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, তাহলে সঞ্চিত বস্তুগুলি অবলম্বন করে তাঁরা শিশুর শিক্ষাকে এগিয়ে দিতে পারেন। এই সঞ্চয়ন প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বগতি ঘটিয়ে মহাপুরুষদের বাণী, ভালো গদ্য বা পদ্যের সংকলন, সংবাদপত্রের নানা প্রবন্ধ বা রচনার সংকলনে (Paper-clippings) সন্তানকে নিয়োজিত করা যায়। মহামানব-দের অমূল্য বাণী শিশুর সমগ্র জীবনকে আলোকিত করে রাখতে পারে, তার পথ চলার নিশানা হতে পারে।

সঙ্গলাভ

শিশুর আর একটি আকাঙ্ক্ষা হল সমবয়সীদের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। অনেক বাবা-মা শিশুকে আগলে রাখেন। পাড়াপড়শীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেন না। তাঁরা মনে করেন, নিজেরাই শিশুর সঙ্গী হয়ে শিশুর সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষুধা মেটাবেন। এ ধারণা একটি মারাত্মক ভুল। শিশুর স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশের জন্য তার সমবয়সী, এমন কি তার চেয়ে কিছু ছোট বা বড়দের সঙ্গ – খাদ্য, আলো, বাতাসের মতই প্রয়োজন। দুবছর পর্যন্ত শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক থাকে। তারপর থেকেই সঙ্গীসাথী পেলেই তাদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। পাঁচ, ছয়, সাত, আট প্রভৃতি বয়সে সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করে, গান করে হেসে-খেলে শিশুরা পরম তৃপ্তি পায়। এ-তৃপ্তির থেকে তাদের বঞ্চিত করলে স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

অনুকরণ

অনুকরণের প্রবৃত্তি সন্তানের জন্ম থেকেই থাকে। অনুকরণ করতে কাউকে শেখাতে হয় না। হাঁটা চলা, কথা বলা, উচ্চারণ ভঙ্গি, জামা পরা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের সব কাজ অনুকরণের মাধ্যমেই শিশু শেখে। এজন্যই বাপ-মা ভাইবোনদের আচার – আচরণ শোভন ও মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। গুরুজনদের আচার-আচরণে সব সময় একটা সতর্কতা থাকা প্রয়োজন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা অজ্ঞাতসারে তাঁদের অনুকরণ করে চলেছে – এটা মনে রাখা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাড়ির গুরুজনরা খাওয়া, পড়া, শোওয়া, বসা, কথা বলা যে-সব সদভ্যাস প্রতিদিনের জীবনে বজায় রাখেন, বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব ব্যাপারে সেই সদভ্যাসগুলি বিনা চেষ্টায় অর্জন করছে।

নিয়ন্ত্রণ

শিশুর মধ্যে যেমন একটা স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে, তেমনি তারই পাশাপাশি আছে নিয়ন্ত্রিত হওয়ারও আকাঙ্ক্ষা। সে যেমন স্বাধীনতা চায়, তেমনি চায় পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতির সস্নেহ নিয়ন্ত্রণ। এ ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সত্য অভিভাবককে মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়েই সন্তানকে আত্ম-আবিষ্কার করতে সহায়তা করতে হয়।

স্বাধীনতা আর নিয়ন্ত্রণ – এই দুই-য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অবাধ স্বাধীনতা ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনেক সময় একটা দায়, একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। তা বহন করা তাদের পক্ষে ক্লান্তিকর, কষ্টকর। যেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই, স্বাধীনতায় বাধা দেবার কেউ নেই, সেখানে তারা দিশেহারা হয়ে যায়।

সন্তানরা স্বাভাবিকভাবে ভব্য আচরণ এবং কর্তব্যের একটা কাঠামোর ভিতরে থাকতে চায়। কোনটা সঠিক আচরণ, কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য – এই বোধ নিয়ে তারা চলতে চায়। নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই এই বোধটি তাদের মনে দিয়ে দিতে হয়। আর এই বোধটি পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একবার বোধ এসে গেলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারে, কখন কোন বিষয়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তারা স্বেচ্ছাচারিতার পথে পা বাড়াচ্ছে, কখন প্রত্যাশিত দায়িত্বটুকু তারা পালন করছে না।

এতক্ষণ সন্তানের মন নিয়ে, তার জন্মগত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। সন্তান মনের এই স্বভাবগুলির চরিতার্থতার সময় ব্যক্তি ও সমাজের কথা ভাবতে হবে। যেমন সন্তানকে স্বাধীনতা দেবেন, কিন্তু কতটুকু? সমস্ত বয়সীদের সঙ্গে মিশতে দেবেন, কিন্তু কাদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করবেন? কৌতূহল চরিতার্থ হতে দেবেন, কিন্তু যে-কৌতূহল অশোভন, অশালীন তাকে নিবৃত্ত করতে হবে। তেমনি, সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করবেন, তা বলে কি সহপাঠীর নতুন বইটি, ভালো পেন্সিলটি লুকিয়ে সংগ্রহ করবে? সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর জন্মগত সংস্কারগুলি যাতে বাঞ্ছিত পথে তৃপ্ত হয়। অবাঞ্ছিত পথে তৃপ্ত হতে চাইলেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ এমন শোভনভাবে করতে হবে যাতে সন্তান কখনোই মনে করবে না তার স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে, তার ব্যক্তিত্ব আহত হচ্ছে! বিচক্ষণ অভিভাবকের এটাই হল বিচক্ষণতা।

ডঃ সুখময় সেনগুপ্ত

ফটো : অমিতাভ রায়

গ্রামগঞ্জের 'ভর'

'এমন ওষুধ দেব তিন চার বছর বাদে বাদে বাচ্চা হবে! প্রাণ রক্ষা করব। ধ্বংস নয় রে বালিকা।'

'ওরে পেটে যে তোর সাপ হয়েছে পাগ্‌লী। খুব পচা জল দেব, আমার নাম করে খাবি। পারবি তো রে বেটি? আর তোর তো ওপারে যাবার সময় হয়েছে, কেন তবে চিকিৎসে করা? এখনো এ পৌথিবীতে বাঁচবার শখ? তোদের নিয়ে আমার জ্বালার শেষ নেই....'।

সত্যি নেই! ওপরের কথাগুলি দেবতার। একজন গ্রাম্যবধূ 'ভরে' পড়েছেন। স্বয়ং মা-কালী নেমে এসেছেন তাঁর শরীরে। তিনি যা বলছেন সব দেবতার কথা; দাসীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে। 'ভরে'র মা-কে ঘিরে অনেক যাত্রী দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন। লাইন দিয়ে দশ পয়সায় মুদো ধরছেন। মনের ব্যথা জানাচ্ছেন, উত্তর ও ওষুধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। অগাধ বিশ্বাসে ঘটের পচা জল, গাছের শিকড়, পাতা ফুল জয় মা-জয় মা বলে নিয়ে চলেছেন। এমন দৃশ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটু ঘুরলে দেখা যাবে। এই জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে এমনই 'ভর' দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। উপস্থিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তাঁরা আসেন? উপকার সত্যি কি হয়?

দেবতার মুখনিঃসৃত বাণী (যদিও ভণ্ড বলে মনে হয়েছে) যা দিয়ে এ লেখনীর শুরু সেটি হল দঃ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত কেওড়াডাঙা গ্রামের নস্করপাড়ার 'ভর'। এ অঞ্চলে বৃন্দাবন-মাস্টারের বউয়ের মা-কালীর 'ভর' সর্বজনবিদিত। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এই ভর হয়ে থাকে। যদিও এ 'ভরে'র অনুষ্ঠানটি দেখে নিছক অভিনয় ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তথাকথিত প্রাথমিক মাস্টার বৃন্দাবনবাবুর সুচতুরা স্ত্রী 'ভরে' থাকাকালীন আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে '– বেরিয়ে যা বালিকা –' বলে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিলেন। আসবার সময় দেখলাম উপস্থিত গ্রাম্যবধূদের চোখে কী ভীষণ ভয়ের ছায়া। তাঁরা তখন ইষ্ট নাম জপ করছেন। ঘটনাটি ছিল এরকম – প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি তো ঈশ্বর, বল তো আমি কেন



পেঁয়াজগঞ্জের ভর। ভরের দেবী চলে যাচ্ছেন

এসেছি?' – উত্তর এল দৈবী কণ্ঠে – 'পরীক্ষায় পাশ করবি কিনা জানতে এয়েছিস্।' বললাম, 'আমার তো পড়াশোনার পাট কবেই চুকে গেছে, এখন কোনো পরীক্ষা তো দিইনি!' রাগত স্বরে দেবী বললেন, 'তবে তোর শরীর খারাপ বালিকা। বললাম, 'বর্তমানে তো কোনো অসুখ নেই'। উনি চিৎকার করে বললেন, 'আমার মনুমেন্ট ভাল না, অনেক যাত্রী বসে – তুই এখন যা, কুবারে আসবি তোকে সব বোঝাব।' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনুমেন্ট কী? – একথা দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?' চিৎকার করে বললেন, – 'বালিকা তুই আমাকে ছলনা করতে এসেছিস্। লেখাপড়া শিখেছিস্ মনুমেন্ট জানিস্ না?' বললাম, 'মনুমেন্ট মানে জানি শহিদ মিনার। আর যদি তোমার কাছে মনুমেন্ট মানে অন্য কিছু হয় তবে বলে দাও তা কি?' ক্ষিপ্ত দাসীর দেহে উপস্থিত দেবী চিৎকার করে বললেন – 'ওরে বেরিয়ে যা...'। অসহায় আক্রোশে আসনে বসে উনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। উপস্থিত মহিলারাও নির্বাক। চলে আসবার সময় ওঁর উপার্জনের এই অভিনব পদ্ধতি দেখে একথাই মনে হল, গ্রামাঞ্চলে কুসংস্কার যেমন মোছেনি তেমনি শিক্ষার আলোও জ্বলেনি জ্ঞানের আলো হয়ে। আমতলা থেকে ৯৭ বাসে জোড়াদোকান স্টপে নেমে মাইল তিনেক হাঁটার পরেই এই 'ভরে' পৌঁছানো যায়। একমাত্র ঠিকানা– এ গ্রামে এসে বললেই হবে বৃন্দাবন-মাস্টারের বাড়ি যাব।

দ্বিতীয় 'ভর' পেঁয়াজগঞ্জ। ধর্মতলা থেকে ৭৬, ৮৩, ৮৩-এ যে কোনো বাসে শিরাকোল স্টপে নামতে হবে। এখানে নেমে উস্থি রোড ধরে মাইল দুয়েক হেঁটে গেলেই পেঁয়াজগঞ্জের মানিক মহিষের বাড়ি। এখানেই মা-কালীর 'ভর' হয়। এক বছর ধরে এই 'ভর' হচ্ছে। এখানেও দশ পয়সা দিয়ে জানতে হয়। ওষুধ বাবদ স'-পাঁচ আনা থেকে এক টাকা– দু টাকা– আরো অনেক। ওখানে যখন পৌঁছলাম দুপুর দুটো। 'ভর'-পড়া ভদ্রমহিলা আপাদ-মস্তক কাপড়ে মুড়ে দুই হাঁটু বুকের কাছে নিয়ে কান্নার সুরে বলে চলেছেন – '...নেসতে বলেছিলুম পারলি না কেন রে পাগল! এখন তো সে ঠান্ডায় আছে। আমার ওষুধে এট্টু কমেছে। কি রে ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ মা-এখন এট্টু কম আছে। তবে বড্ড খিস্তি দেয়।' দেবীর প্রশ্নের উত্তরে কথাগুলি বলল ১৬-১৭ বছরের এক কিশোরী। তার মা পাগল হয়ে গিয়েছে। এখানে এসেছে ওষুধ নিতে, যাতে মা ভাল হয়। বাড়ি তার শিরাকোল। নাম চম্পা রায়।

হঠাৎ দেখলাম 'ভরে'-পড়া ভদ্রমহিলা ঘুরে পড়লেন অপরদিকে মুখ করে। লক্ষ্য করছিলাম মাঝে মাঝে উঁকি কাপড়ের ভিতর দিয়ে বাইরে উপস্থিত মানুষদের লক্ষ্য করছিলেন শিকারি বিড়ালের মতো। একদল কিশোরী ও একজন গ্রাম্যবধূ হঠাৎই হেসে ফেলে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন 'ভরে'র দেবী। 'হাসছিস কেন রে সব – হাসছিস কেন? আমায় নিয়ে অচ্ছেদা? –ওরে এ কি কাল এল...' বলে অনবরত নিজের মাথাটা মাটিতে ঠুকতে লাগলেন। সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। শাঁখ ঘন্টা বাজল। হেসেছে কেন? 'ভরে'র গায়ে উপস্থিত ভক্তদের ছায়া পড়েছে। তাই দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। আড়াইটেয় 'ভর' শেষ। সন্ধের আগেই সব কিছুর সমাপ্তি। 'ভরে'-পড়া ভদ্রমহিলা দুহাত উঁচু মাটির ঢিবি থেকে গড়াতে গড়াতে পুকুরের ধারে পড়লেন। দু-মিনিটও লাগল না ভদ্রমহিলা উঠে বসলেন। মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরালেন। এই প্রথম তাঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য উপস্থিত সকলের হল। দেখলাম দু-চোখের দৃষ্টি চতুরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে পারিপার্শ্বিক। এই 'ভরে' কৌতূহলী যাত্রী হিসাবে আমতলা শাখা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কর্মী চিত্ত বৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন। ওঁর সহ-যোগিতায় ওখানে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই 'ভরে'র ভদ্র-মহিলাকে পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামী। বড় করুণ তাঁর দৃষ্টি। অসহায় ক্ষুধাই তাঁকে বসিয়ে রেখেছে স্ত্রীর পদতলে। এখানে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী স্বয়ং মা-কালী। তিনি বাস্তবের বৃদ্ধ শিব।

তৃতীয় 'ভর' আমতলা। বিধবা ভদ্রমহিলার উপরে বাবা তারকনাথের 'ভর'। এ 'ভরে'র উপরেও অনেকের অগাধ বিশ্বাস। এখান থেকে উপকৃত এক মহিলার কথায় – 'আমাদের গ্রামের অতুল মাস্টারের বউ,তাঁকে মাইমা বলি। সেই বলেছিল আমতলা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে ভক্তদের বাড়ির বাবা তারকনাথের 'ভর' জাগ্রত। তাঁর কথা শুনেই এখানে আসা। আমাদের রেডিও চুরি হয়েছিল। বাবা বললে – 'তোদের নিজেদের লোক নিয়েছে, বাড়ি যা পাবি।' তা পেলুমও। আর একটা ব্যাপারেও এসেছিলুম। আমার ছেলে, পাগ্‌লা বলে ডাকি – সে একটা মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করেছিল। আত্‌দিন (রাতদিন) তার বাড়ি পড়ে থাকত। ওর সঙ্গ ছাড়াবার তরে বাবার থানে আসি। দশ পয়সা দিয়ে গোনাতে বলল – 'তোদের জাতের মেয়ে নয়। ছেলের মন অন্য করে দিয়েছে। সরষে পোড়া দিলে ভাল হবে। এক ডাকে একশ গ্রাম সরষে কিনে আনবি। পড়ে দিলে রোজ সকাল বিকাল পাখায় (উনুনে) দিতে হবে। যতদিন না ওদের ছাড়াছাড়ি হবে ততদিন দিয়ে যাবি।' তা আমার কপালে ওই পোড়া সরষে দুবার পাখায় দিতেই কাজ হয়েছিল। ছেলে আর ওই মেয়েটার বাড়ি যায় না। এখন মন দিয়ে কাজ করছে ছেলে আমার, আমতলায় ভ্যান চালায়। আর সে মেয়েটারও বে' হয়ে গিয়েছে। তা হ্যাঁ বোনঝি তুমি এসব লিখছ কেন? কাগজে উঠবে? ওঃ বাবা কি বলে ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইসব কি? তা কই লেখ দেখি আমার একটা চাকরি দেয় কিনা দেখব। নার্সিং হোমে আয়ার চাকরি। হুঁঃ কাগজয়ালারা কী করে দেখব!'

না হেসে পারলাম না। বললাম, 'কেন বাবা তারকনাথই তো তোমার চাকরি দিতে পারে!'

'তা পারে বইকি, আমি তো সব ভরে' ঘুরে বেড়াই যদি আমার একটা চাকরি হয়।'

চল্লিশ বছরের বিধবা গ্রাম্যবধূ কুন্তী নস্কর। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন। অনেক হাসপাতালে ঘুরেছেন একটা আয়ার কাজের জন্য, জোটেনি। এখন তাই থানে থানে 'ভরে'র দেব-দেবীর কাছে ঘুরে ফেরেন একটা চাকরির আশায়। যদি দৈব ওষুধে কাজ জোটে! চলে আসছি উনি বললেন – 'হয়তো তোমাকেই বাবা তারকনাথ পাঠিয়েছে। তোমার এইসব লেখনেই আমার চাকরি হবে।' – অসহায় অবুঝ' গ্রাম্যবধূকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই। বলতে পারলাম না বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। তাই কাষ্ঠ-হাসিতেই মিষ্টতার ইতি টানতে হল।

জানিনা এরকম 'ভরে'র দেব-দেবীদের দ্বারা কত মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে, সমাজের উপর এর সুফল ও কুফল কতটা বর্ষিত হচ্ছে। গ্রামের এইসব ঘটনার উপর পর্যবেক্ষণ করবার নৈতিক দায়িত্ব কি সমাজবিজ্ঞানীরা কখনও নেবেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই 'ভরে'র ওষুধ কত মানুষকে বশ করতে গিয়ে পাগল করে দিয়েছে। কত ভ্রূণহত্যা করতে গিয়ে অসহায় নারীর প্রাণ নিয়েছে। কত নিরীহ ভদ্রলোককে বাড়ি ছাড়া করবার জন্য বাড়িউলি গিন্নী ভরের ওষুধ ও সরষে পড়া বাড়ির চারপাশে ছড়িয়েছে। কলা পড়া খাইয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে এনে বধিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কত কপোত-কপোতীর প্রেমে ভাঙন ধরিয়েছে সংসার সুখের করতে। আবার কখনও অমৃতের ধারাও বর্ষিত হয়েছে বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে। যেমন – কেওড়াডাঙা গ্রামের নস্করপাড়ার 'ভরে'র ওষুধ খেয়েই খিদিরপুরের দুর্গাদেবীর ভাই পাগল অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। রাঁচী প্রবাসী পাবেড়িয়ার শম্ভু সাধুখাঁকে হাসপাতাল ফিরিয়ে দিয়েছিল। পেটের গণ্ডগোল সারাতে পারেনি। 'ভরে'র দেবী সারিয়েছে, আবার 'ভরে'র সরষে পোড়া কুন্তী দেবীর উপার্জনশীল উপযুক্ত ছেলেকে বিপথ থেকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছে। স্বপ্নের অবসান যুক্তিতেও সবসময় স্বচ্ছ নয়। বিদগ্ধ – পণ্ডিতজনের কাছে বলি, এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? না-কি সবটাই গ্রাম্য কুসংস্কার অথবা মিথ্যার বেসাতি নিয়ে চরম চতুরতার খেলা!

চন্দ্রা মিত্র

ফটো : প্রীতিকুমার সরকার

নির্যাতনের বলি যে মেয়েরা

কন্যা সন্তানকে অনেক অভিভাবক বিশেষ যত্নে শিক্ষা-দীক্ষায় ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেইসব কন্যা যখন বধূ হয়ে স্বামীর ঘরে যান তখন আশাভঙ্গ ও মনস্তাপে বিবাহ বিচ্ছেদ বা আত্মহননের পথ বেছে নেন। আবার অনেকে উপযুক্ত শিক্ষিতা না হবার জন্য অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে স্বামীর সংসারেই থেকে যেতে বাধ্য হন। এ ধরনের কয়েকজন মহিলার দুঃখের বারমাস্যা হল এই রচনা।

শ্যামলী বসু

রূপার দূরসম্পর্কের পিসি যখন সৌগতর সঙ্গে রূপার বিয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব দিলেন, সে প্রস্তাব রীতিমত অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল রূপাদের বাড়িতে। ওরে বাবা, ওরা যে বেজায় বড়লোক! পাত্রের দাদু স্টিভেডর। বাবা বিখ্যাত ব্যবসায়ী। পাত্র সৌগত অল্প বয়সেই এক নামী সদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

'ওরা আমাদের মেয়েকে বউ করবেন কেন?' মনের দুর্দমনীয় আশাকে দুরাশা জেনেই রূপার মা প্রশ্ন করেছিলেন।

'কেন রূপাই বা কি কম শুনি? অমন সুন্দরী মেয়ে বাঙালির ঘরে কটা আছে?' – পিসি ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন। 'ফিলসফিতে এম এ পাশ করে কলেজে পড়াচ্ছে, আমি সব বলেছি ওদের। ওরা মেয়ে দেখতে চেয়েছে।' পিসি জানিয়ে দেন।

মায়ের মনের গোপন সাধ – মেয়ে যেন এমন বাড়িতেই পড়ে। সত্যি তাঁদের মেয়ে বড় সুন্দরী, ডক্টরেটের জন্য তৈরি হচ্ছে। গানে ডিপ্লোমা আছে, শান্ত, নম্র স্বভাব, আর কি চাই?

সত্যি রূপের জোরে রূপা সৌগতদের বাড়ির বউ হয়ে আসে। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মেয়ের সুখের কালিমা মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় না। মেয়ের ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে তার মন। না, রূপা শ্বশুরবাড়িতে একটুও সুখী নয়, আদৌ কোনো শান্তি পায়নি সে সেখানে। শ্বশুর পরিবারের অর্থ কৌলীন্য আছে, কিন্তু নেই রুচি বা ভদ্র মানসিকতা।

সংসারের কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করার অধিকার নেই তার। স্বামীর অত্যধিক মদ্যপান এবং বহির্মুখিনতায় কষ্ট পায় সে। কিন্তু একদিন মৃদু প্রতিবাদ করায় স্বামীর যে রূঢ় পাশবিক রূপ সে দেখেছিল, তাতে তার সংস্কারবদ্ধ মধ্যবিত্ত মন স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল। এ বাড়িতে সে যেন একটা 'শো পিস' মাত্র। বাড়ির দামী আসবাব, পর্দা, বাসনপত্রের মত। বাড়ি সাজাতে একটি সুন্দরী শিক্ষিতা বউয়ের দরকার ওই পর্যন্তই তার প্রয়োজন। তা বলে স্ত্রীর কথা শুনবে স্বামী? এ বাড়িতে এমন হাস্যকর অসংগত কথা রূপার, আসার আগে শোনা যায়নি। সব চাইতে দুঃখের কথা, পরিবারের মেয়েরাই বোঝেন না মেয়েদের অবমাননার দুঃখ। রূপার শাশুড়িও তার ব্যতিক্রম নন। বউয়ের থমথমে মুখ দেখে তিনি অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠেন, 'স্বামীর কাছে এত মতামত জানাবার দরকার কি? কে শুনতে চায়? খোকা যখন পছন্দ করে না, তখন চুপ করে থাকলেই পার।' শাশুড়ির গলা আরো চড়ে। 'তাছাড়া এ বাড়ির কর্তারাও কখনো মেয়ে, বউয়ের কথায় ওঠাবসা করেনি, করবেও না।' চাপা তর্জনে তিনি বলেন, 'তাছাড়া আমিও তো অনেক সহ্য করেছি, তুমিই বা পারবে না কেন?'

ননদ-জায়েরাও চমকিত এবং বিরক্ত হয়। কেউবা মুখটিপে হাসে। এটা কি বিলেত-আমেরিকা? এত ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, নিজস্ব মতামত নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি

কেবল রূপার ক্ষেত্রেই নয়, রূপার মত অনেক মেয়ের ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন ছেলের পক্ষ নিয়েই পুত্রবধূকে শাসন করেন। সেই বিচার প্রায়ই নিরপেক্ষ হয় না, তাই বউরা সুবিচারও পায় না। তাছাড়া শিক্ষিত মেয়েরা চায় স্বামীর 'সচিব প্রিয়া শিষ্যা' হতে – সচ্ছল সংসারের 'শো পিস' হতে চায় না তারা। তিলে তিলে এমন যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে মরে যে বধূরা, বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে মরার অধিক।

শ্বশুরবাড়িতে স্বামী বা অন্যান্য পরিজনদের হাতে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসে কোনো মেয়ে। কাউকে বা পুড়িয়ে কিংবা অন্যভাবে মেরে ফেলা হয়। এই বধূহত্যা আর আত্মহত্যায় বধূটির জীবনযন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সারাজীবন নিরুপায় হয়ে প্রতিকারহীন উৎপীড়ন সহ্য করে মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়ার ইতিহাস বড়ই নির্মম। আর এর ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকবে এই আশায় সোনালীর বাবা-মা তার বিয়ে দিলেন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে – যদিও দুজনের বয়সের তফাত একটু বেশি। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বয়স, মানসিকতা, রুচি আর সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধানে সোনালীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। লেখাপড়া শিখে ডিগ্রীর জোরেই যে পুরুষ 'মানুষ' হয় না – সোনালীর স্বামী গিরীন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। গিরীনদের বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত সেকেলে। প্রতি পদে স্ত্রীর ওপর নিজের মতামত জাহির করাই 'স্বামীত্বের অধিকার' বলে মনে করা হত সে সংসারে। বাবার 'ফিউডাল মনোভাব গিরীনের মধ্যেও পুরোমাত্রায় বর্তমান। স্বামীর কথার ওপর প্রতিবাদ করার অপরাধে যেদিন স্বামীর সজোর থাপ্পড় নেমে এসেছিল তার গালে, সেদিনই সোনালীর কাছে পৃথিবীর মানে যেন পাল্টে গেছে। বিশ শতকের শেষেও এমন পরিবার থাকতে পারে? স্বামী এমন মূর্তি ধরতে পারে? আহত অভিমানে সোনালী কেঁদে পড়ল বাবা-মার কাছে। মেয়ের অপমানে তাঁরাও ক্ষুব্ধ। কিন্তু সোনালীর ভাইরা কিছুতেই আর প্রসন্নমনে বোনকে ফিরিয়ে নিতে চাইল না তাদের সংসারে।

সুমিতার মত মেয়েরা স্বামীদের উৎপীড়ন অদৃষ্ট বলেই মেনে নেয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সুমিতা। সুদর্শন, শিক্ষিত, স্মার্ট এবং সুউপায়ী স্বামী সুমিতার মধ্যবিত্ত সংস্কারবদ্ধ জীবনে অনেকখানি আশার আলো জাগিয়ে দিয়েছিল। নিজেকে বেশ গরবিনী বলে মনে হত তার। কিন্তু চাকরিতে বেশ কিছুটা উন্নতি হবার পর – কি যে নেশা ধরল রথীনের! প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নেশা করে মাতাল অবস্থায়, রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করে দিল। ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর পেরিয়ে গেলে এক-একদিন বাড়ি ফেরে রথীন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সজাগ হয়ে বসে থাকে সুমিতা। একবার রাগ করে বেশ দেরি করেই দরজা খুলেছিল। দরজায় রথীনের অধৈর্য করাঘাত আশেপাশের অনেক ফ্ল্যাটবাসীরই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন পাশের ফ্ল্যাটের বউটি সেলাই দেখার ছল করে সুমিতার ফ্ল্যাটে এসে মুখটিপে হেসে প্রশ্ন করেছিল, 'কাল বুঝি কর্তার সঙ্গে রাগারাগির পালা চলছিল ভাই? দরজা খোলনি কেন?' নিঃশব্দে সে ব্যঙ্গ হজম করতে হয়েছিল সুমিতাকে – বিনা প্রতিবাদে। তার চোখমুখ রাঙা হয়ে গিয়েছিল লজ্জায় আর অপমানে। তাছাড়া রথীনের মত্ত অবস্থা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিল বলে হিংস্রমুখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রথীন।

রথীনের হিংস্রতায় আর সুমিতার অস্ফুট কান্নায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওদের চার বছরের মেয়েটির। যার সদ্য ঘুমভাঙা চোখে বিস্ময় আর ভয়ের ছায়া দেখে লজ্জায় দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছা করছিল সুমিতার। তাই আজকাল রথীন ফিরতে দেরি করলেও কিছু বলে না সুমিতা। তবে বাপের বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া পাশ কোর্সে বি এ পাশ করার ডিগ্রীখানা সম্বল করে এ ঘর ছেড়ে কোন অকূলে ভাসবে সে? তার কনভেন্টে পড়া মাসতুতো বোন রত্নার কি অবস্থা? স্বামীর উৎপীড়নে ঘর ছেড়ে চলে এসে ডিভোর্স নিয়েছে রত্না। একটা বেসরকারী ফার্মে রিসেপশনিস্টের চাকরিও জুটিয়েছিল। কিন্তু এখন ওপরওয়ালার নেকনজরে পড়ে রত্নার অবস্থা জল থেকে আগুনে পড়ার মত। তাই রথীনের মত্ত অবস্থার চড়চাপড় সহ্য করা ছাড়া সুমিতার উপায় কি? তাছাড়া অনেকের তুলনায় খেয়েপরে সে তো ভালই আছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী এক ভদ্রলোক নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মত্ত অবস্থায় ফিরে মাঝে মাঝেই স্ত্রীকে মারধোর করে, বাছা বাছা কদর্য বিশেষণে ভূষিত করে। সন্তান হয়নি বলেই নাকি স্ত্রীর প্রতি তার রাগ প্রকাশের এই ভঙ্গি। শীর্ণ চেহারার স্ত্রী মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে পরের দিন সকালে স্বামীদেবতার আপিসের ভাত রাঁধতে বসত। সহৃদয়া কোনো প্রতিবেশিনী তাই দেখে মহিলাকে ধিক্কার দিলে, মহিলা বিবর্ণ হেসে বলে, 'কি করব ভাই, ছোটবেলা থেকেই মা-ঠাকুমার

মুখে শুনে এসেছি স্বামী বিনা মেয়েদের গতি নেই। লেখাপড়াও তো তেমন শিখিনি, কোন ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেছে। নিজের একটা ছেলেমেয়েও নেই, দুঃখ বুঝবে কে?'

এই সংস্কার-বন্ধতা, – অর্থাৎ স্বামী বিনা মেয়েদের কোনো গতি নেই, প্রায় প্রবাদবাক্যের মত গেঁথে গেছে মেয়েদের মনে। এ সংস্কার-মুক্তি সহজে সম্ভব নয়। তাই সবরকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন মেয়েরা কিছুটা নিরুপায় হয়ে মুখ বুজেই সহ্য করে, পরিণামে যাই হোক না কেন। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না – এই তো সর্বংসহা বাঙালি মেয়ের চিরকালের পরিচয়। তবে সংসারে এর দাম কোথায়?

উগ্রস্বভাব স্বামীর হাতে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের কথা বলতে অনেক বধূই লজ্জা পায়। তাই মাথার চোট কিংবা গায়ের কালসিটে দাগগুলো 'পড়ে গেছি, ধাক্কা লেগেছে' এইসব বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে। স্বামীর ভালবাসার ভাগিনী না হবার অগৌরবের কথা পাঁচকান করতে তাদের লজ্জা খুবই স্বাভাবিক। তবে পাশের ঘরে কৌতূহলী জা অথবা ননদদের কাছে আসল তথ্য অজানা থাকে না। মায়ের ওপর বাবা যে নিষ্ঠুরতা দেখায়, তার হতচকিত সাক্ষী শিশুসন্তান প্রায়ই অন্যদের কাছে সত্য কথাই বলে দেয়। এতে অবশ্য বধূর লজ্জা ও অপমান বাড়ে বই কমে না।

আর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন মেয়েদের সইতে হয় অনেক কারণেই। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দশ-এগার বছর স্বামীর ঘর করার পরও হঠাৎ কোনো মেয়ের পায়ের তলার মাটি সরে যায়, যখন তার স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে ডিভোর্স নেবার জন্য জেদাজেদি করতে থাকে। দশ-এগার বছর একসঙ্গে ঘর করার পর এমন একটি কারণে স্বামীর নির্লজ্জ ব্যবহার স্ত্রীর কাছে কতখানি মর্মবেদনার কারণ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝার কথা নয়। স্বামীর ঘর নামক নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়চ্যুতির সম্ভাবনায় সে মেয়েটি তো কাতর হবেই, তার সঙ্গে স্বামীর দুর্ব্যবহার, অত্যাচার তার উপরি পাওনা। ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে কোনো কোনো মেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, কিছু কিছু আত্মীয়স্বজনও এমন সময় পাশে এসে তাকে আশ্বাস জুগিয়েছে, স্বামীর ব্যবহারের নিন্দা করেছে। হার মেনে থেমে গেছে স্বামী। ডিভোর্স বা সেপারেশন অবধি গড়াল না এ ঘটনা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একে অপরের কাছ থেকে অনেক সরে এসেছে। দুজনের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। একই ছাদের তলায় বুকভরা ঘৃণা আর অবিশ্বাস নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করা, এ কাজ কেবল মেয়েরাই পারে। ছেলে-মেয়েরা কবে বড় হয়ে মায়ের দুঃখ বুঝবে – এই দুরাশা মনে রেখে যন্ত্রের মত সংসার করে চলার দুর্লভ শক্তি মেয়েরাই রাখে। কিন্তু তার, মনেপ্রাণে কী তিক্ততা, কী বিষাদ। নিঃশব্দে এমন যন্ত্রণা সহ্য করার পরিণামে সেই মেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে 'স্যাডিস্ট' হয়ে ওঠে।

এত নির্যাতন, অপমান, মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেও মেয়েরা স্বামীর ঘরেই পড়ে থাকতে চায়, কথা প্রসঙ্গে জানালেন এক মহিলা অ্যাডভোকেট। 'স্বামীর হাতে বা শ্বশুরবাড়িতে নানাভাবে নির্যাতিত হলেও খুব কম মহিলাই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসে বা আদালতের শ্বারস্থ হয়। সমস্যার তুলনায় শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশের বেশি মহিলা আইনের সাহায্য নিতে এগোয় না।' তার কারণ কি – এ প্রশ্নের উত্তরে অ্যাডভোকেট মহিলা জানালেন, 'প্রথমত মেয়েরা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আর কুণ্ঠায় তাদের যন্ত্রণার কথা চেপে রাখে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন তাদের জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর ঘরে থেকে অনেক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হলেও নিরাপত্তা সে পায়। কারণ স্বামীর ঘর ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েদের একমাত্র ভরসা এবং আশ্রয় বাপের বাড়ি। তবে সেও নিতান্ত সাময়িক আশ্রয়, সে আশ্রয়েরও স্থিরতা নেই। মেয়ের জীবন-যন্ত্রণায় বাবা-মার পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও তাঁরা নিরুপায়। কারণ বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা ছেলে-বউয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে তাঁরা মেয়েদের স্বামীর ঘরেই ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। বুদ্ধিমতী মেয়েরাও ভায়েদের সংসারে গলগ্রহ হয়ে অশান্তি আনতে চায় না। যতই নির্যাতিত হোক – নিরুপায় যন্ত্রণায় সবই সহ্য করে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তার দুঃখ ঘোচাবে এই আশায়।' কিন্তু সে আশা কি সবসময়ই পূর্ণ হয়? – এ প্রশ্নের উত্তরে মহিলার মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। সে হাসির অর্থ মেয়েরাই কেবল বুঝতে পারে।

■

গৃহসজ্জা

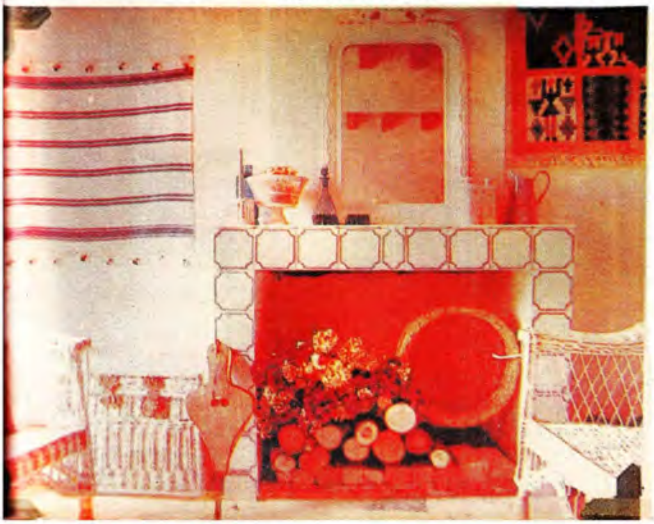


দেওয়াল সজ্জা

ঘরের দেওয়ালকে সুন্দরভাবে সাজাতে হলে সবসময় যে সুন্দর রঙের ব্যবহার, ছবি বা নিদেনপক্ষে একটা সুন্দর ছবিওলা ক্যালেন্ডার দিয়েই ঘর সাজাতে হবে তা নয়। আমরা আরো নানা টুকিটাকি জিনিস দিয়েও দেওয়াল সাজাতে পারি। যেমন ঃ যদি হালকা সবুজ হলুদ বা গোলাপী রঙেরই একটি শেড 'মাশরুম' রঙের দেওয়াল হয় তাহলে আমরা সেই দেওয়ালটিতে দেওয়ালে আটকাবার যে মাটির ফুলদানি পাওয়া যায় সেইরকম ফুলদানি একটি, দুটি বা তিনটি ওপর নিচে একটু তেরচাভাবে বা তিনটি পাশাপাশি আটকে তাতে ফুলের বদলে সবুজ, সতেজ পাতা দিয়েও রাখতে পারি। সবুজ সতেজ পাতার অভাবে প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর সবুজ পাতা, নানা রঙের ফুল ইত্যাদিও রাখা যেতে পারে। ফুলদানির গায়ে অল্প করে এঁকে নিলে ফুলদানির বাহার বাড়ে। ফুলদানির বদলে বাতিল করা লং প্লেয়িং রেকর্ড দিয়েও দেওয়াল সাজানো যায়। একটি পুরনো লং প্লেয়িং রেকর্ডকে প্রথমে একটি বড়সড় মোমবাতি বা একটু বড় আকারের যে কাচের বাতিগুলো পাওয়া যায় তার ওপর এমনভাবে ধরতে হবে যাতে রেকর্ডটির মাঝামাঝি জায়গার দুপাশে লম্বালম্বিভাবে আগুনের তাপটি লাগে। রেকর্ডটির যে কোনো দুটি বিরোধী প্রান্তভাগ হাতের তেলোয় ঠেকা দিয়ে রাখতে হবে তারপর আগুনের তাপে রেকর্ডটি বাঁকবার মতো হলে দু দিক দিয়ে দুটি প্রান্ত এমনভাবে মুড়তে বা রোল করতে হবে যাতে দু পাশের প্রান্তগুলিকে একবার করে মোড়ার পরই দুটি প্রান্ত পরস্পর পরস্পরের ওপর চলে আসে আর মোড়কের যে কোনো একটি দিক, যেন সরু ধরনের হয়, তাহলে এটি হবে নিচের দিক যাতে ফুল রাখলে নিচে থেকে গলে না পড়ে যায়। এই ফুলদানির আকৃতি হবে অনেকটা ইংরাজী V অক্ষরের . মতো।



রেকর্ডটির যে দুটি প্রান্ত একটি অপরটির ওপর যেখানে চলে আসে ঠিক সেইখানে পেরেক লাগাবার ফুটোটি করিয়ে নিতে হবে খুব সাবধানে। এরপর কালো রঙ কিনে সুন্দর করে লাগাতে হবে। তারপর রঙ তুলি দিয়ে এর ওপর নকশা আঁকা যেতে পারে। এবার এই নতুন ধরনের ফুলদানিটির মধ্যে কিছু ফুলপাতা রেখেই দেখুন। আবার, রেকর্ডটি না বাঁকিয়ে তাতে ভালোভাবে কালো রঙ করে রেকর্ডটির ওপর সুন্দর ছবি বা আলপনা আঁকা যেতে পারে। রেকর্ডের মাঝখানের ফুটোটি পেরেক আটকানোর সহায়তা করবে। এবার নিজেই দেখুন তো কত সহজেই পুরনো, ফেলে-দেওয়া রেকর্ডগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। দেওয়ালে শুধুমাত্র সুন্দর সুন্দর আয়না টাঙিয়েও অনেকে ঘর সাজিয়ে থাকেন।



এ বার দেওয়াল সজ্জার একটি সহজ উপায় বলি। রঙিন মার্বেলপেপার বা সাধারণ একরঙা 'রঙিন কাগজের (রঙিন দেওয়ালের ওপর সাদা ভালো কাগজেও কাজ চলে) ওপর আলপনার মতো করে সুন্দর নকশা এঁকে নিন গোল, ত্রিকোণ, চৌকো যেমন খুশি। এ বার একটি কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কাগজটি নকশা অনুযায়ী কেটে নিয়ে সামান্য গঁদ বা সেলোটেপ দিয়ে। দেওয়ালে আটকে দিন দেখুন কেমন বাহার হয় ঘরের। ছাঁচে তোলা মাটির যে সব মুখ কিনতে পাওয়া যায় তা দিয়েও দেওয়াল সাজাতে পারেন। সুদৃশ্য 'ওয়াল-হ্যাঙিগং'-ও এ ব্যাপারে আদর্শ। এছাড়াও বেতের বোনা চুপড়ি ইত্যাদি দেওয়ালে আটকে দিলে দেওয়ালের অন্য বাহার হবে। কিছু না পেলে নিদেনপক্ষে একখানা মাটির পট বা সরা কিনে তার ওপর রঙ তুলি দিয়ে সামান্য কারিকুরি করে টাঙিয়ে দেখুন না, কেমন দেখায়। নানারকম সুন্দর সুন্দর মুখোশ কিনে এনে দেওয়ালে টাঙানো যায়। মসৃণ প্লাইউডেরওপর সুন্দর ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিন, বিশেষ করে দেওয়ালের যে অংশে একটু আলো কম পড়ে, এতে অতিথি সহজেই আকৃষ্ট হবেন। তবে, মনে রাখতে হবে এই ধরনের ছবিতে একটু চড়া রঙের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কারণ, প্লাইউডের রঙ হালকাই হয়।

এক ফুট আন্দাজ একটি ফাঁপা বাঁশের খোলের মধ্যেও পাতা বা ফুল রাখা যেতে পারে। এছাড়া, একটি বেশ বড় আকারের ধপধপে সাদা খোলের ডিম নিয়ে তার গায়ে খুব সাবধানে একটি ফুটো করে কুসুম এবং সাদা অংশ বার করে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ড্রপারে জল দিয়ে ভেতরটি ধুয়ে, বাইরেটি পরিষ্কার করে খুব সরু তুলি দিয়ে যে কোনো গাঢ় রঙের ব্যবহারে সূক্ষ্ম ছবি এঁকে দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারে।

ছোট ছোট মাদুর কিনে এনে তার ওপর সুন্দর করে ছবি এঁকে দেওয়ালের শোভা-বাড়ানো যেতে পারে। যাঁরা ভালো সেলাই করতে পারেন তাঁরা কাপড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর ছুঁচের কাজ করে (অবশ্যই দেওয়ালের রঙের সংগে মানিয়ে) তাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙাতে পারেন। এই ধরনের জিনিস অনেক পুরনো বাড়িতেও দেখতে পাওয়া যায়। আবার চট কিনে তার ওপর ক্রুশ স্টিচ দিয়ে সেলাই করেও চারধারটি রঙিন রিবন দিয়ে বাঁধিয়ে চার কোণে চারটি পেরেক দিয়ে দেওয়ালে আটকে দেওয়া যেতে পারে।

বাড়িতে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে এক কাজ করুন। সুন্দর চাঁদমালা কিনে আনুন। শোলার তৈরি নানারকম সূক্ষ্ম নকশার দেওয়ালে আটকাবার মতো জিনিসও কিনে আনতে পারেন। চাঁদমালা কিনে তাকে সরাসরি দেওয়ালে আটকে দুই বা তিনটে ভাগকে আলাদা আলাদা করে দেওয়ালে পাশাপাশি বা ত্রিকোণের আকারে আটকে দেখুন দেওয়ালের বাহার বাড়বে বই কমবে না – উৎসবের একটি



আলাদা মেজাজ এসে যাবে। শোলার জিনিসে ঘর সাজালে সাজানোর ব্যাপারে অভিনবত্ব আসতে বাধ্য। এছাড়াও ফুলের ছোট্ট ছোট্ট থোকা করে সেলোটেপ দিয়ে দেওয়ালে আটকে দিন – পরিবেশটি আরো কতই না মোহময় হয়ে উঠবে!

সবশেষে বলি, এত সব জিনিস ছাড়াও আরো যে সব জিনিসে দেওয়াল সাজানো যায় তার মধ্যে ভারী ভারী পেতলের তৈরি জিনিসের কদর খুব বেশি। তবে, খুবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আমাদের গৃহস্থ বাড়িতে ঘরের দেওয়াল সাজাবার জন্য এ জিনিসের সাহায্য না নেওয়াই ভালো।

শর্মিলা ঘোষ

রবীন্দ্রানুরাগী সন্‌জীদা খাতুন



ছবি : [illegible]

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও হিসেব-নিকেশ বারেবারেই আমাদের সাংস্কৃতিক দিব্যদৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে চায়। সেখানে সান্ত্বনা এই, সভ্য মানুষ সমস্ত ডামাডোলের মধ্যেও শেষপর্যন্ত তার হৃদয়প্রপ্রাত আগলে রাখে, রাজনৈতিক অনুশাসনে তার অস্তিত্বের বাহিক বাস্তবতা যতই বাঁধা পড়ে থাক, সে আসলে মুক্তি খোঁজে তার অন্তর্নিহিত সত্যের মধ্যে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধুমাত্র এই কারণেই জীবনে অন্তর দিয়ে যা প্রতিষ্ঠা করা যায়; তাকে কোনো রাজরোষই উপেক্ষার বিষয় করে তুলতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এই উপলব্ধিই সবার আগে উচ্চকিত হয় এবং এই উপলব্ধির অসন্দিগ্ধ সত্যতা আমি আরেকবার যাচাই করার সুযোগ পেলাম সম্প্রতি বাংলাদেশের এক অগ্রজা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা সম্মানীয়া সন্‌জীদা খাতুনের সঙ্গে কথা বলে। অনেকেই হয়তো বলবেন, ব্যাপারটা এভাবে ভাবছি কেন, রবীন্দ্রচর্চার স্বভাবস্ফূর্তি – কি বাংলাদেশ, কি পশ্চিমবাংলা – দু-দেশেই এক – কারণ,দু-দেশেরই ভাষা বাংলা। বাংলা-ভাষায় কথা বলব, রাগ অনুরাগ প্রকাশ করব, অথচ রবীন্দ্রনাথ থাকবেনও না – এ চিন্তা, এটা ঠিকই মূর্খের কল্পনাবিভ্রম মাত্র। কিন্তু একটি কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করা দরকার, দু-দেশের ভাষা এক হলেও সামাজিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা প্রমাণ করতে শুধু একটি কথা বলা যথেষ্ট মনে করি তা হল, এদেশে রবীন্দ্রতৃষ্ণার সঙ্গে তার সরবরাহ যতটা নিশ্চিত এবং নিরুপদ্রব, এই কিছুকাল আগেও ওদেশে তা ছিল না, সেখানে বাংলাভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ – সবই ছিল জীবনপণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিষয়। রবীন্দ্রচর্চায় এখানে যে স্বস্তি, তা কিন্তু ওখানে 'হাত বাড়ালেই আকাশ' পাওয়ার মত কোনো ব্যাপার নয়।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সন্‌জীদা খাতুন জানান, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পশ্চিমবাংলা তথা সারা ভারতে যখন গভীর উদ্দীপনা ও উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়েছিল তখন ঢাকায় তা পালিত হয়েছিল তৎকালীন সরকারের বিপুল বিরোধিতা সামনে। বাঙালিকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া সরকারের এই বিরোধিতার সঙ্গত কোনো কারণ আমরা কখনোই খুঁজে পাইনি। যে কারণে লঘুগুরু নিগ্রহ, অপমান এমনকি চাকরিচ্যুতির মত নানান ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েও আমি এবং আমার মত অনেকেই রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ শেষ পর্যন্ত পালন করতে পেরেছিলাম। আর এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রেরণা থেকেই স্থাপিত হয়েছিল দুটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সংস্থা – ছায়ানট ও ঐকতান।

এই ছায়ানট সাংস্কৃতিক সংস্থাই কিছুকালের মধ্যে মূলত সংগীত বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় দুজন রবীন্দ্রানুরাগীর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। এঁদের একজন ওয়াহিদুল হক এবং অন্যজন এই মুহূর্তে আমি যাঁর মুখোমুখি – অর্থাৎ সন্‌জীদা খাতুন।

কথায় কথায় সন্‌জীদা খাতুন জানালেন, ছায়ানট আজ ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রধানতম রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি পেলেও এর পরিণতি ও প্রসারের ইতিহাস আসলে এক সংগ্রামের ইতিহাস। কারণ, ১৯৬১ সালে ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা হলেও মাত্র ক'বছর বাদে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় তখন ঢাকার বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পরে ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার সচিব আলতাফ গওহরের কাছে প্রতিবাদ জানালে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার শুরু করা হয়। কিন্তু তার উপর আবার কোপ পড়ে ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন। ওইদিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন এক নির্দেশ জারি করে পুনরায় রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেন। যদিও এর প্রতিক্রিয়া শেষপর্যন্ত সরকারের পক্ষে সুখের হয়নি। কারণ এর প্রতিবাদেই তখন সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীরা আবার একবার গর্জে উঠেছিলেন। এবার আর এই প্রতিবাদ তাৎক্ষণিক ছিল না। সেটা হয়ে দাঁড়াল সুদূরপ্রসারী। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালে ঢাকায় ২২ শ্রাবণ পালিত হয়, যা ছিল আসলে রবীন্দ্রানুরাগের অপ্রতিরোধ্য এক উদ্বেল প্রকাশ। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি প্রকারান্তরে হয়ে ওঠে '৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান এবং '৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা।

এই প্রেরণা, বলাই বাহুল্য, একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নাতীত স্বীকৃতি এবং অন্যদিকে মুক্তকণ্ঠে তাঁর গান গাইবার অধিকার অর্জনে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের প্রাণের আর্তিকেই প্রকাশ করে।

এই প্রেক্ষিতে সন্‌জীদা খাতুনের কাছে আমি আমার অনিবার্য কৌতূহলটি মেটাতে গিয়ে প্রশ্ন করি : রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপনাদের এই শ্রদ্ধা, অনুরাগ, যা আপনাদের সাংস্কৃতিক জীবন পেরিয়ে রাজনৈতিক জীবনেরও প্রেরণাপ্রতিম – এর সঙ্গত কারণ কী? উত্তরে সন্‌জীদা নম্র অথচ অসংশয়িত-চিত্তে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাঙালি জীবনের প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে জানলে, বুঝলে সত্যিকারের বাঙালি হয়ে ওঠা যায়, এটা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমাদের কাছে আদর্শস্বরূপ। জীবনবোধ ও দর্শনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন খাঁটি বাঙালি, পূর্ণ বাঙালি, যা হয়ে ওঠাই আমাদের পথ বলে আমাদের মনে হয়।

সন্‌জীদা খাতুনের জন্ম ১৯২১ সালে, ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (প্রয়াত) ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। তিনি বরাবরই ফরিদপুরের মানুষ হলেও সন্‌জীদার মা সাহেদা খাতুন ছিলেন হুগলীর। বিশিষ্ট ঠুংরী গায়ক মোহম্মদ হোসেন এই পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাবা-কাকার পর সন্‌জীদাই ছিলেন তাঁর শেষ শিষ্য। পরবর্তীকালে শিল্পী হিসেবে সমাদৃতা হলেও সন্‌জীদা বেশি আগ্রহবোধ করেন সংগীত শিক্ষকতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ করে তার ধ্বনি, খুব ছোটবেলা থেকেই সন্‌জীদাকে আকর্ষণ করত। এই আকর্ষণের দাবিতেই তিনি একসময় এম এ পড়তে আসেন শান্তি-নিকেতনে। ছায়ানট পরিচালনা ছাড়াও সংগীত সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগের পুরোধা সন্‌জীদা। আজ বাংলাদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার যে আগ্রহ, এই সংগীতের যে জনপ্রিয়তা, তার মূলে সন্‌জীদার সনিষ্ঠ ভূমিকার কথা সে দেশের সকলেই স্বীকার করেন কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সঙ্গে। সন্‌জীদা নিজে কিন্তু এতে খুশি হলেও তুষ্ট নন, তাই যে-বয়সে পৌঁছে সাধারণত বাঙালি রমণীরা জীবনের উচ্ছ্বাস থেকে শত যোজন দূরে থাকেন, সে-বয়সে পৌঁছেও তিনি রবীন্দ্রানুসন্ধানের এক সক্রিয় ছাত্রী। বর্তমানে তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে পি এইচ ডি করছেন; বিষয় রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ। রবীন্দ্রানুরাগী অনেক মানুষের কথাই আমরা জানি। কিন্তু সন্‌জীদা শুধু অনুরাগীই নন, রবীন্দ্রনাথে উৎসর্গীপ্রাণা।

রানা দাস

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি!



চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও দরকার। আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি।

পুষ্টিকর গুণমান ঃ সেরেল্যাকের প্রতিটি ফীডের মধ্যেই আছে সব কিছু যা আপনার বাচ্চার পুষ্টির জন্যে দরকার। এতে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। বাচ্চাদের জন্যে ঠিক যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম অবস্থায় থাকে।

অল্প সময়ে তৈরী ঃ বাচ্চার খিদে পাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী। এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে। আপনি শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন!

খেতে ভাল ঃ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেরেল্যাকের স্বাদ, বাচ্চাদের খুব পছন্দ। অতএব এটা দিয়ে সুরু করাই ভাল। তৈরী করার যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্টি যোগান।

বিনামূল্যে শিশুর বৃদ্ধিসূচী ঃ
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান-
সেরেল্যাক, পোস্ট বক্স ৩
নিউ দিল্লী ১১০০১৮



Nestlé

সেরেল্যাকের মমতা: পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অপূর্ব

SAA/FSL/C/3799 BEN



বসুন্ধরা

সমীর রক্ষিত

বসুন্ধরা ভেবেছিল বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে তারপর পূর্ণার মেয়ের বিয়েতে যাবে।

সৃজন বোস খাটো গলায় বলে – মিস রায়, বাড়ি গিয়ে কি করবেন? চলুন আমার সংগে।

বসুন্ধরা অবাক হয়ে বলে – কোথায় বলুন তো!

– আজ থেকে তো আমার অফুরন্ত ছুটি। সৃজন চাপা কৌতুকে বলে – আজ আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি চলে যেতে পারি।

– পূর্ণাদের বাড়ি তো পৃথিবীর শেষ প্রান্তে না, তোর্সার ধারে। ওখানে অন্তত একবার যেতেই হবে। বসুন্ধরাও চাপা গলাতেই হেসে জবাব দেয়। আশেপাশে এর ওর আনাগোনা এখনো শেষ হয়নি। শেষ বিদায়ের শেষ মুহূর্তটি একটু লম্বা হয়েই যায়, কিছুতেই ইতি হতে চায় না।

– জীবনে দুবার জলে ডুবে মরার ইচ্ছে হয়েছিল, তখন সময় পাইনি মিস রায়। আজ চলুন দেখি তোর্সা নদীতে –

বসুন্ধরা হাসি চাপে, কেননা সৃজনের কথা শেষ হতে পায় না, সেনগুপ্ত এগিয়ে আসে, বলে – তাহলে আসি বোসসাহেব। আসবেন মাঝে মাঝে। করমর্দনের সংগে যথাযথ আবেগের ঝাঁকুনি দিয়ে বলে – রিটায়ার করলেন বলেই আমাদের একেবারে ভুলে যাবেন না যেন।

এরকম কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে অনেকে চলে গেছে, যাচ্ছে। কার্যত ফেয়ারওয়েলের পাট চলেছে। কাজেই সৃজনও একহাতে ফুলের তোড়াটি, টাইমপিস ঘড়ির প্যাকেটটা সাইডব্যাগে নিয়ে পায়ে পায়ে ঘর ছাড়ে। দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত প্রতিযোগীর মতো। বসুন্ধরাও।

– তাহলে আপনারা দুজনে একসংগেই বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন। কে একজন একথা বলতেই বেশ খোলামেলা হাসির ছোট্ট একটা ঢেউ ওঠে।

বসুন্ধরা আর সৃজন দুজনে মিলে আলাদা হয়ে যাবার সময়ে যেন এরকম একটু হাসিরই দরকার ছিল! সৃজন নীরবে হাসিমুখ নিয়ে এগিয়ে যায়, বসুন্ধরা একবার সাগরদীঘি দেখে। সব অপরাহ্ণেই সাগরদীঘি উতল হাওয়ায় এমন ঢেউ তোলে না। শেষ বিকেলের রোদের আভা নিয়ে আজ দীঘির জল হুটোপুটি জুড়ে দিয়েছে। কেন কে জানে!

এই ধরা! এই পিছুডাক শুনে চমকে বসুন্ধরা ফিরে তাকায়। যেন চলন্ত সময় সহসা অনেকটা পেছন থেকে ছুটে আসে।

পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণাই এখনো কৃচিৎ তাকে 'ধরা' বলে ডাকে। পূর্ণা তার কলেজ-জীবন থেকে বন্ধু। বন্ধু নয়, প্রাণের বন্ধু। সব মানুষেরই বোধহয় এরকম একজন ঘনিষ্ঠজন জুটে যায় জীবনে। কলেজে 'ধরা' নামটাই চালু ছিল, এই নামে একটা জোকও ছিল সে-সময়ে, নারীর রূপের স্তুতিকাজে কলেজী তরুণদের কোনোকালেই উৎসাহের অভাব হয় না। ফলে ব্ল্যাকবোর্ডে কিম্বা দেওয়ালের গোপন কোণে 'ধরা' এই শব্দটিকে ঝলসে উঠতে দেখা যেত খড়ির দাগে। বহু তরুণকে তখন কবিতায় চার্জড হয়ে থাকতে দেখা যেত। সেসব ছিল যেন অলীক বসন্তের দিন, দীর্ঘাংগী বসুন্ধরা চারিদিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করত। বসুন্ধরা মানে সেই তখনকার দীপ্ত ধরা।

একটা ভাড়া-ট্যাক্সি এসে পেছনে দাঁড়ায়, জানালায় পূর্ণার সহাস্য মুখ। বসুন্ধরা অবাক, বলে – তুই! তোর না আজ মেয়ের বিয়ে?

– কিছু টুকিটাকি বাকি ছিল। পূর্ণা বলে – চলে আয়।

সৃজন এগিয়েছিল, পেছিয়ে এসে বলে – এখন না, যথাসময়ে যাব পূর্ণা।

– আরে আপনিও। পূর্ণা দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।

– বসুন্ধরা, কেমন আছ? বারিদের গলার আওয়াজে বসুন্ধরা আরেকবার চমকে ওঠে।

তৎক্ষণাৎ দুপা এগিয়ে আসে, বলে – আরে তুমি! কেমন আছ? কতদিনের ছুটি?

– ছুটি! বারিদ পূর্ণার মুখের পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে – টিল ডেথ।

পূর্ণা হেসে বলে – তোর কিছুই মনে থাকে না ধরা, ছমাস আগে রিটায়ার করল না?

বসুন্ধরা আস্তে হেসে বলে – মনের আর দোষ কি? তোমরা যাও, আমি তো চিরকালের লেট পার্টি, আজও লেটেই যাব।

গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করেনি ড্রাইভার, তার যেন তাড়া আছে। এঞ্জিন সশব্দে নড়ে ওঠে।

বারিদ বলে – তাই বলে বেশি লেট করো না যেন। একটু কথাবার্তাও তো বলতে ইচ্ছা করে, নাকি না?

– করে, অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা করে। বসুন্ধরা এ-কথাগুলো উচ্চারণ করে না, এসব

কথা তার মনে বুড়বুড়ি কাটে। ততক্ষণে গাড়ি এগিয়ে যায়।

– পূর্ণা, তুই ভীষণ অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর।

– কেন রে ধরা, আমি কী করলাম? এত গালাগাল দিচ্ছিস!

– তুই কিছুই করিসনি, শুধু সব ভুলে গেছিস।

– কে বলল ভুলেছি, সব মনে আছে। বুকের মধ্যে সব দমচাপা হয়ে পড়ে থাকে। মনে করতে চাই না তাই মনে পড়ে না।

– কেন মনে করতে চাস না?, তোর তো সবই সুখের কথা পূর্ণা? ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস। বারিদ্দের সংগে –

– আর তুই যে-কথাটা জানতে চাস সেটা বলছিস না কেন ধরা? বারিদ তো তোকেই পাবার জন্য অস্থির হয়েছিল, তুই বারিদকে কাটাবার জন্য আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলি – তার জন্য আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে!

– হবে না? দিয়েছিলাম, তাই না তোর আজ এত সুখ। আমি যদি বারিদকে ফিরিয়ে না দিতাম তবে ভেবে দ্যাখ পূর্ণা, আজ আমি–

– বসুন্ধরা, কেন বিয়ে করলি না তুই বারিদকে? কেন আমাকে এগিয়ে দিলি? করলে আমাকে নিজের কাছে এত ছোট হয়ে থাকতে হত না, এত অপমান –

– অপমান! দুঃখবিলাস হচ্ছে, নারে?

– দুঃখবিলাস? তুই বুঝবি না ধরা, তোকে বলে লাভ নেই। যাকে বিয়ে করলাম, প্রতিনিয়ত যদি মনে হয় তার মনটাতে আমি নেই, আছে অন্য একজন, আমি শুধু বিয়ে করা স্ত্রী মাত্র, ভালবাসা নেই। সে যে কী অপমান ধরা, মেয়ে হয়েও কী তুই –

– তুই কী সত্যি বারিদকে নিয়ে সুখী হতে পারিসনি পূর্ণা? সত্যি বল তো?

– সুখ! কী করে বলব, সুখ কেমন তা কি আমি জানি?

– কিন্তু তুই আর বারিদ তো বোকাপড়া করেই পরস্পরকে জেনেই –

– জানা, একজন মানুষ আরেকজনকে কতটুকু জানতে পারে? তুই জানিস না, জানলে একথা তুই মুখে আনতে –

– জানি না? কী করে তুই একথা বলছিস পূর্ণা? এস-ডি-ও ব্যানার্জি সাহেব কী আমাকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেয়নি মানুষকে জানার চেষ্টাটাই কত ভুল।

– তোর রূপ ছিল ধরা, উচ্চাশা ছিল। তোর লম্বা তেজী শরীরটার চেয়েও জোরালো স্বপ্ন ছিল তোর, ব্যানার্জির মতো ইয়ং ব্রাইট ছেলেকে পাবার আশা তোকেই মানাত। দু হাত ভরে তুই তোর সব ওকে দিলি কিন্তু পাবার বেলায় শূন্যমুষ্ঠি, কেউ ভাবতে পেরেছিল? তুই নিজে? মানুষকে জানবে মানুষ?

– আমরা কেউ কারুকে জানি না পূর্ণা। যা জানি ভুল জানি। এই ধর তোর দুঃখটাকেও আমি জানি না, মানিও না। আমি যদি নিজেকে আজ তোর জায়গায় দাঁড় করাই, মনে হয় কত সুখী আমি –

– সুখবিলাস হচ্ছে?

– বিলাস কেন পূর্ণা? তোর কি নেই, ছেলেমেয়ে সংসার সব আছে, কিন্তু আমার, আমার কি আছে বল, মরার আগের আয়ুটুকু ছাড়া?

– একি মিস রায়, করছেনটা কী? ট্রেন আসছে, দাঁড়ান। সৃজন খপ করে বসুন্ধরার হাত চেপে ধরতেই অর্থহীন চোখে ফিরে তাকায় বসুন্ধরা। এতক্ষণ চলতে চলতে পূর্ণার সংগে তার গোপন মনের কথোপকথনের যে স্পষ্ট ছবিটা তৈরি হয়েছিল, এক মুহূর্তে তা ধোঁয়া হয়ে যায়। বারিদকে পূর্ণাই এখানকার অফিস থেকে জোরালো তদ্বির করে শিলিগুড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পূর্ণা যেন ক্ষেপে উঠেছিল। কেন এমন করছিস পূর্ণা? – বসুন্ধরার এই প্রশ্ন শুনে কী পূর্ণা এইসব কথাই বলেছিল সেদিন? স্মৃতি বড় প্রতারণাপ্রিয়, স্মৃতিকেও কি আজ সবটা বিশ্বাস করা যায়?

সামনে লেভেলক্রসিং। মান্ধাতার আমলের কয়লার ইঞ্জিন, যত না গতি, শব্দের আড়ম্বর তার চেয়ে অনেক বেশি; গলগলিয়ে উগরে উঠছে কালো ধোঁয়া। তোর্সার ব্রিজের ওপর উঠতেই শূন্যগর্ভ শব্দের তেজ তুমুল হয়ে ওঠে। যেন অন্তিম পথে চলেছে এক ভারবাহী পশু, শেষযাত্রায়। ক্রমে হুইসেলের ক্ষীণতর আর্তনাদ নিয়ে ট্রেন চলে যায় গীতালদহের দিকে।

গেট খুলে যেতেই বাস লরি রিকশা মানুষ ব্রিজ পারাপার হতে থাকে। বসুন্ধরা আর সৃজন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়, কোলাহল কমে গেলে ব্রিজ পার হতে থাকে দুজনে।

সৃজন ডান হাতের ফুলের তোড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলে – ঠিক ওখান থেকেই একদিন নদীতে ঝাঁপ দেব ভেবেছিলাম।

বসুন্ধরা চোখ সরু করে বলে – আপনার কী এখনো সেই ইচ্ছেটা রয়ে গেছে মনে মনে?

– না। এখন আর তো জোর করে মরার দরকার নেই। সৃজন বলে – মৃত্যুর দিন তো এখন এমনিতেই ঘনিয়ে আসছে।

নদীর স্রোতের দিকে এক পলক তাকিয়ে বসুন্ধরা শুধায় – আচ্ছা সৃজনবাবু মরার আগে আপনার শেষ ইচ্ছেটা কী? অবকোর্স ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন্ড –

একথায় সশব্দে হেসে ওঠে সৃজন, ব্রিজের স্টিল-ফ্রেমে-বসা একটা ঘুঘু সহসা উড়ে যায়। ডানার শব্দ হাওয়ায় মিশে যায়।

– আমি কি ফাঁসির আসামী নাকি মিস রায়, যে শেষ ইচ্ছাটা জানতে চাইছেন?

– সব মানুষেরই একটা শেষ ইচ্ছা থাকে, সে ফাঁসির আসামী হোক চাই না হোক।

– অবশ্য একদিক থেকে ভাবতে গেলে মানুষ মাত্রেই তো ফাঁসির আসামী, মরণের ফাঁস তো সবার সামনেই ঝুলছে সারাজীবন – আবার হাসে সৃজন।

বসুন্ধরা আনমনে শোনে কথাটা। নিচে নদী, মাথার ওপরে প্রকাণ্ড আকাশ, পশ্চিমে বহুদূরে গ্রামরেখার ওপরে সূর্য পাটে বসেছে। নদী বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ রেখে কল্পনার ছবির মতো মনে হয় রক্তাভ দিগন্ত; আজকের দিনের এই আলোর রঙটা কি সম্পূর্ণ নতুন, অন্য যে কোনো দিনের চেয়ে আলাদা?

বসুন্ধরা বলে – আপনি কিন্তু জবাবটা দিলেন না, অবশ্য যদি আপত্তি থাকে ... ...

ব্রিজের ফ্রেমটা পেরিয়ে এখন আকাশ উন্মুক্ত, মুখটা সামান্য ওপরে তুলে সৃজন বলে – আসলে উত্তর একটা আছে আমার মিস রায়, কিন্তু কী জানেন, চট করে বলে ফেলতে পারছি না। একটু সময় লাগবে। আচ্ছা, আপনার শেষ ইচ্ছাটা কি জানতে পারি?

–বলব, আমি আগে প্রশ্ন করেছি। আপনাকে আগে বলতে হবে – বসুন্ধরা দেখে অস্তসূর্যের ডগাটিকে ডুবে যেতে দেখে বহুদূরে।

– আচ্ছা আসুন একটা কাজ করি, নিচে ঐ মাঠে নেমে যাই। সৃজন সহাস্যে বলে নদীর ওই বাঁকটার মুখে গিয়ে বলব।

– আবার নামবেন? দেরি হয়ে যাবে না?

– দেরি কেন, শর্ট কাট হবে। আসুন – বলে রাস্তার উঁচু ঢাল বেয়ে নামতে থাকে সৃজন। যৌবনে এক দৌড়ে নেমে যাবার অভ্যাস ছিল সৃজনের, নদীর এ ধারটা তার প্রিয়, আশৈশব।

সাবধানে, ধীর পায়ে, ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে নামে বসুন্ধরা। কিছুটা নিচু থেকে ফিরে দেখে সৃজন, উঁচু ঢালের মাঝখানে বসুন্ধরা, তার পেছনেই আকাশ। আঁচলটা হঠাৎ সামান্য পিছলে গেল। বসুন্ধরাকে এই মুহূর্তে বিশাল এক দেবীমূর্তির মতো মনে হয়। দুপা উঠে আসে সৃজন, হাতটা তার এগিয়ে যায় অজান্তেই, বলে – ধরুন

ভীত চোখে এক পলক তাকায় বসুন্ধরা, তার পড়ে যাবার হয়তো সত্যি কোনো ভয় নেই; কিন্তু তবু নিচের থেকে এগিয়ে দেওয়া হাতটা – 'দরকার নেই' বলে ফিরিয়ে দিতে তার মায়া হয়। হাত বাড়িয়ে সে সৃজনের হাতটা ধরে ফেলে, বলে ইস, কীরকম রিস্কি বলুন তো!

– কৈশোর যৌবনে মানুষের ইচ্ছে শক্তিটা খুব জোরালো থাকে; সেটা একটা গোঁয়ের পর্যায়েই পড়ে। আমি ভেবেছিলাম চারপাশের মানুষের সুখদুঃখের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলব, নিজের জন্য আলাদা সুখ চাইব না। তোড়জোড়ও চলছিল নিজেকে তৈরি করার, কলেজ জীবনে হৈহৈ করে নেমে পড়তে যাচ্ছিলাম দশজনের কাজে। সমাজ বদলের

চেষ্টায়। নেমেও ছিলাম – কলেজের গণ্ডিটা পেরোতে না পেরোতে দেখলাম আমি নজরবন্দী হয়ে গেলাম। পৈতৃক সংসার আমাকে বন্দী করে ফেলল। একবার ভাবলাম গরাদ ভেঙে পালিয়ে যাই, পালাতে গিয়ে থমকে গেলাম। মন বলল – নিজের মনকে বাঁচাতে পারো না, দশজনের সুখদুঃখের ভার নেবে? সে ভাবনাটা যে ভুল ছিল আজ বুঝি। আজ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি যাদেরকে নিজের মানুষ ভেবেছিলাম আসলে তারাও দশজনেরই একজন। আর শুধু একজনকে আলাদা করে বাঁচানো যায় না। ন জনকে না বাঁচিয়ে একজনকে আলাদা করে বাঁচাতে যাওয়াটা মূর্খামি। মানুষ একসঙ্গে বাঁচে মরে।

পায়ের তলায় পিছিয়ে যায় ফাটা ফুটো ফসলের ক্ষেত, ফসল কাটা হয়ে গেছে। হেমন্তের ধান ক্ষেত এখন সারি সারি, কাটা ধানের গোড়া জেগে আছে মুড়ো ঝাঁটার মতো। সৃজন বলতে বলতে হাসে, খুব আস্তে, লাজুক মুখে একবার বসুন্ধরাকে দেখে নিয়ে বলে – কথাগুলো কী খুব সেন্টিমেন্টাল শোনাচ্ছে না।

– শোনায় যদি শোনাক না, আমি ছাড়া তো আর কেউ শুনছে না। বসুন্ধরাও হাসে – আমাদের কথা বোধহয় এরকমই শোনাবে এখন।

– সংসার উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কিন্তু সংসারী হলাম না। সুযোগও হয়তো ছিল না, থাকলেও উপেক্ষা করলাম কিছু ক্ষোভে রাগে অভিমানে। সংসার দাঁড়িয়ে গেল, আর আমি ক্রমে একলা হয়ে গেলাম। মা বাবা চলে গেল যেমন যায়, ভাইবোনেরা দূরে সরে গেল যেমন যায়। জীবনের নিয়মে, মানুষের জীবনের যা নিয়ম। কেউ এখন আমেরিকায়, কেউ বোম্বেতে, কেউ কলকাতায়। আমি আছি, থাকব যতদিন না মরণ এসে বলবে – চলো সৃজন, অনেক বেলা হল।

রুমালে চশমা মোছে সৃজন, বসুন্ধরা মুখ মোছে আঁচলে। আকাশের আলো কালো হতে শুরু করেনি – এখনো জ্বলজ্বলে, হেমন্তের গোধূলির যেমন স্বভাব।

– জন্মান্তরে তো বিশ্বাস করি না, করলে হয়তো বলতাম – আমার শেষ ইচ্ছে আবার জন্ম নেব, মানুষের জন্য কাজ করব, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নেব, তাদের সুখী করব। জন্মান্তরে নয়, এ-জন্মেই আর যতদিন সময় আছে মরার আগে, ছোটছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতে ইস্কুল করব, যারা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না –

– তাহলে এটাই আপনার শেষ ইচ্ছে? বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে পড়ে নদীর বাঁকের মুখে।

সৃজনও দাঁড়ায়, নদীর দিকে মুখ, হাসি-মাখানো, বলে – এটাকে তুমি শেষ ইচ্ছা বলতে পারো, তবে আরেকটা ছোট অংশও আছে এর সঙ্গে ডিউ পার্ট।

এই প্রথম, বহুদিন এক অফিসের সহকর্মী দুজনে, তবু এই প্রথমবার সৃজন বসুন্ধরাকে 'তুমি' সম্বোধন করে। যেকোনো নতুন কথাই চট করে কানে লাগে ছোট্ট হলেও। বসুন্ধরা এক মুহূর্ত নীরবে তাকায়, সৃজনের কাঁচাপাকা চুলে মৃদু হাওয়ার কাঁপন, বসুন্দরা বলে – ডিউ পার্টটাও বলুন।

– না না, এবারে তোমারটা! বসো বসো, আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বলে সৃজন ঘাসের ওপর বসে পড়ে। তখনো বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে, দুঃখিত মুখ তুলে সৃজন বলে –তোমাকে তুমি বললাম বলে রাগ করলে না তো ধরা?

বসুন্ধরা শব্দ তুলে হেসে ওঠে, বলে – আপনি যে কেন আমাকে এতদিন আজ্ঞে আপনি করতেন সেটাই আমার কাছে রহস্য। আচ্ছা, আপনি তো পূর্ণাকে তুমি করেই –

হ্যাঁ পূর্ণাকে বলতে পেরেছি, তোমাকে না।

– কেন?

– হয়তো তুমি পাঁচ সাত আর আমি পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি, এক ইঞ্চি ছোট আমি তোমার চেয়ে, সেজন্য। বলতে বলতে হাসি সামলায় সৃজন।

বসুন্ধরাও বলে – না, আপনি হাসির কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন আসল কথাটা –

খানিক নীরব হয়ে সৃজন বলে – হয়তো তাই, হয়তো এই কথার মধ্যেই আমার শেষ কথাটা লুকিয়ে আছে। কিন্তু তুমি বলো ধরা – তোমার সেই যৌবনকালে তুমি যখন তোমার ওই পাঁচ সাতের সতেজ শরীরটা নিয়ে রাস্তায় হেঁটে যেতে – শহরের সেই রাস্তা কি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যেত না? মুখের ভেতরে দুটো বাঁধানো দাঁত, গালের ত্বকে এখন মেছেতার দাগ, চোখের আশেপাশে, কপালে চুলসরু বলিরেখা নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসুন্ধরা ঘাসে বসে পড়ে। কোথায় যেন, হয়তো দূরে হোগলা বনে এক ঝাঁক শেয়াল ডেকে ওঠে এ সময়।

রূপই আমার কাল হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে কী অহঙ্কার জমে যায় না মনের মধ্যে? ইস্কুলে থাকতেই প্রেমপত্র উড়ে আসতো জানালা গলে, চড়ুইয়ের মতো, এমন কি রাস্তাঘাটেও এবং ডাকে। কলেজে তো ছেলেরা যেকোনো কমিটি হলেই তাতে বসুন্ধরাকে চাই বলে –

ইংরেজির জাঁদরেল প্রফেসর বি-এম যে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল তার জন্য কে দায়ী? সৃজন হাসে।

– হয়তো আমার রূপ। বসুন্ধরা হাসে না, গাঢ় গলায় বলে – বলেছিলেন বাড়িতে এসো, ইংরেজিটা দেখিয়ে দেব। দেখিয়েছিলেন, দুচারদিন যেতে না যেতেই ইংরেজির সঙ্গে নিজের আসল রূপটাও – বিরক্ত হয়ে শেষদিন হঠাৎ অজান্তে একটা চড় মেরে দিয়েছিলাম। কারুকে কোনদিন বলিনি – এই প্রথম বললাম আপনার কাছে, সৃজনবাবু।

সৃজন বলে – আমার কাছে না, তুমি নদীর কাছে বলো – নদী সব কিছু নিয়ে চলে যায়।

সহসা সামান্য ক্ষুব্ধ গলায় বসুন্ধরা চলকে

ওঠে – সব নিয়ে যায় ? কিছুই কী ফিরিয়ে দেয় না ?

– সময় আর নদী, এরা কখনো আর ফিরে আসে না। কিছু ফিরিয়েও দেয় না, ধরা। মৃদু শব্দে উচ্চারণ করে সৃজন আপন মনে। মাঠের একটু ওপরে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে, সামান্য শীত-হাওয়ার ভেতরে বসুন্ধরা বলে – দেয় দেয়, ফিরিয়েও দেয়। শুধু দুঃখটাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কেন শুধু অনুতাপ আর যন্ত্রণাটুকুই ফিরিয়ে দেয় বলুন তো ?

– নিতে নেই, নিও না ধরা। সব ভুলে যেতে হয়। ভুলও অবশ্য এসে যায়। সৃজন বলে – বিস্মৃতি এসে যাবে, মেমারি ফেইল করবে, সব –

– আহ্। মৃদু শব্দে বসুন্ধরা বলে – তবে কেন ভুলে যেতে পারি না ? পাগল হওয়া বারিদকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ? পূর্ণাকে খেলার মতো এগিয়ে দিয়েছিলাম ? নিজের হাতে –

সৃজন শান্ত ভারী গলায় বলে – তুমি স্বার্থপর, লোভী তাই দিয়েছিলে। ব্যানার্জিকে তখন তো তুমি ধ্যানজ্ঞান করেছ, তুমি অন্ধ। কিছুই দেখনি – বারিদকে না, কাউকে না।

– হাতে তুলে দেওয়া ভালবাসা ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি ভালবাসার জন্য কাঙালপনা করেছিলাম। বসুন্ধরা হাসে, হাওয়ায় কুয়াশা উড়িয়ে আবছায়ার ভেতরে তার হাসির শব্দ সবেগে দুলে ওঠে। বলে – বেশ হয়েছে, না ? দারুণ –

একটা ছিপনৌকো বেয়ে একজন মানুষ – অস্পষ্ট আলোয় নদীর ভাটিতে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সৃজন বলে – আমাদের জীবনটা এরকমই একটা বিচিত্র খেলা। মর্মান্তিক –

– না সবটাই খেলা না সৃজনবাবু। সহসা দৃঢ়স্বরে বসুন্ধরা প্রতিবাদ করে বলে – ব্যানার্জিকে আমার ভালবাসায় কোনো ফাঁকি ছিল না, খাদ ছিল না। আপনি জানেন না, মেয়েরা যখন কাউকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে –

– শুধু মেয়েরা কেন, ছেলেরাও কী কম পাগল ? কিন্তু কিছুই কিছু না যদি ঠিক ঠিক দুটিতে মিলে না যায়। যদি না মেলে তবে ভালবাসাও পূর্ণ হয় না ধরা – সৃজনের কথা শেষ হতে না হতে বসুন্ধরা উষ্ণস্বরে বলে ওঠে – ভেবেছিলাম মিলেছে বুঝি, ব্যানার্জিও বুঝি আমাকে ছাড়া কিছু জানে না। সে যে কী উত্তেজনা কী সুখ ! কিন্তু সে যেন বুদ্বুদ, ফানুস – ব্যানার্জি যখন চলে গেল বুঝলাম মানুষ কত নিষ্ঠুর, বিশ্বাস ভালবাসার কোনো মর্যাদা নেই, ভালবাসাটা শুধু অভিনয় ছিল ওর –

– তাই যদি বলো ধরা, তবে তো ভালই হয়েছে। যেলোক বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে না, ভালবাসা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলে, তার জন্য কিসের দুঃখ ?

– কিসের দুঃখ, একেকবার তাই ভাবি। বসুন্ধরার দুটি নিষ্প্রভ চোখের তারা ম্লান আলোয় আরো করুণ দেখায়, বলে – তবু মন মানে না কেন, বুক ভেঙে যায় কেন, আজো ?

– কে জানে, হয়তো ভালবাসার এই নিয়ম। সৃজন বলে –কে জানে হয়তো ব্যানার্জিও এখন তার নিজের সংসারের মধ্যে বসে এখনো তোমার কথা ভাবে, হয়তো অনুতাপ অনুশোচনায় –

– না না। হঠাৎ তীব্র বাধা দিয়ে বসুন্ধরা বলে ওঠে – অমন লোকের অনুতাপ, আমি বিশ্বাস করি না ! একটা জীবন শেষ করে দিয়ে যদি অনুশোচনা হয়ও তবে সেটাও আমার অপমান, কারণ সেটা কী আমার প্রতি করুণা ? আমি ওকে ঘৃণা করি –

– ঘৃণা করো। সৃজন হাসে – ঘৃণা করো তবু বুক ভেঙে যায়, হায় ধরা !

অসম্ভব ক্লান্ত ভঙ্গিতে কী যে নিঃশব্দ একটা হাসি হাসে বসুন্ধরা, বলে – সত্যি, ঘৃণাও করি – বুকও ভেঙে যায়। ভুলতে চাই ভুলতে পারি না। মানুষের মন এমন পাজি কেন গো সৃজনবাবু ?

কালো আকাশে তারা ফুটছে একে একে, সৃজন ঊর্ধ্বমুখে বলে – এই তো জীবন ধরা, ঘৃণারও ভালবাসারও। সুখেরও দুঃখেরও, যন্ত্রণার –

– এ জীবন শেষ হলে বাঁচি, আর ভাল লাগে না। বাঁচতে আর সাধ নেই, অনেক হল।

– মিথ্যে কথা। কেউ মরতে চায় না, চাও বলো ? সৃজন সোজা হয়ে বসে, বলে ধরা, বাঁচা মানেই প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাঁচা। তুমি এখনো বেঁচে আছ, আরো অনেকদিন বাঁচবে।

– বাঁচব। বাঁচব এই ভেবেই বুকটা শুকিয়ে যায়। ভয় হয়। কি করে বাঁচব ?

– নতুন করে বাঁচবে। সৃজন মৃদু উত্তেজনায় একমুঠো ঘাস চেপে ধরে, বলে – শুনতে চাও তো বলি ধরা, জীবনের অমর্যাদা করতে নেই, আমাদের এ জন্ম তো দুবার আসে না।

বসুন্ধরা এক চিমটি হেসে বলে – যৌবনে মনে হত, এ জীবনের তুলনা নেই।

– আমার এখনো, আজো তাই মনে হয় ধরা। সৃজন হেসে বলে – বিশ্বাস হয় না ?

– হয়, তুমি যা পাগল। তুমি হয়তো পারো –

– পাগল ! হয়তো তাই। পাগল বলেই মনের না-বলা ভালবাসাটা আজো গোপনে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। আর তা পেরেছি বলেই এখনো বাঁচতে, ভয়ানক বাঁচতে ইচ্ছে করে –

– কার জন্য এমন গোপন ভালবাসা তোমার জানতে পারি ?

– জীবনকে ভালবাসার, এই মনুষ্য জন্মটাকে। সৃজন হেসে বলে – আর সেজন্যই তোমাকেও।

– আমাকেও ? তুমি ? তুমিও !

– হ্যাঁ, ভালবাসতে নেই বুঝি ? আমি অতি সাধারণ বলে তোমাকে ভালবাসতে নেই বসুন্ধরা ?

ভয়ানক অবাক হয়ে বসুন্ধরা চোখ তুলে বলে – তা তো জানি না, কিন্তু মুখ ফুটে বলনি তো কোনদিন।

– ভালবাসার কথা গোপনে বাঁচিয়ে রাখারও একটা উত্তেজনা আছে ধরা। বলিনি, কেননা সময় হয়নি।

– আজ বুঝি সময় হল ?

– হ্যাঁ, আজ হল। আজ তুমি আমি সমান নিঃস্ব, সমান একা। শুধু আমি জিইয়ে রেখেছি আমার শেষ ভালবাসাটুকু –

মুখের ওপর একটা ক্লান্ত হাত তুলে বসুন্ধরা বলে – একথা এত দেরিতে বলতে হয় সৃজন ?

সৃজন বলে – পৃথিবীর কোনো কিছুতেই দেরি বলে কোনো কথা নেই ধরা ! প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই পৃথিবী নতুন, যা চলে যায় শুধু তাই পুরনো – আমরা নতুন করে বাঁচব।

– নতুন করে ? বসুন্ধরা টের পায় তার দুটি চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে, বুকের মধ্যে পাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছে। আর্দ্র গলায় সে বলে – আমি যে ফুরিয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছি সৃজন।

– শেষ ! কোথায় শেষ, আমরা তো শুরু করতে যাচ্ছি –

– শেষ না ? আমি মরে গেলে কেউ আমার মুখের আদল নিয়ে বেঁচে থাকবে না, কেউ আমাকে মনে করে চোখের জল ফেলবে না, আমি এমন নিঃস্ব, বসুন্ধরার এই কথা অন্ধকারে সহসা হাহাকারের মতো হাওয়ার টানে ছড়িয়ে যায়, নদীর বুক থেকে শীতের কুয়াশাময় হাওয়া উঠে আসে। ফসলহীন দিগন্তঘেরা মাঠের শূন্যতায় চোখ রাখে সে, ওপরে তাকিয়ে দেখে তারাভরা আকাশ ঝাপসা হয়ে এলো, অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে নদী, দূরে কোথায় যেন সানাই বাজছে।

নিজের চোখের উদ্গত অশ্রু লুকোতে চায় বসুন্ধরা, লুকোতে গিয়ে সবলে সে নিজের মুখটা চেপে ধরে নিজের হাঁটুতে, তার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে ফোঁপানোর শব্দে।

সৃজন ব্যাকুল হয়ে সামান্য এগিয়ে আসে, নিঃশব্দে ডানহাতটা বসুন্ধরার নির্জন পিঠের ওপর রেখে মুখ নিচু করে, খুব নিম্নকণ্ঠে বলে – কাঁদছ ধরা, কাঁদো। খুব কেঁদে নাও, এতদিনের এত কান্না বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে তুমি বাঁচবে কি করে বলো দেখি ?

সহসা সৃজনের হাতটা কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে চেপে ধরে বসুন্ধরা সবলে, আর সেই মুহূর্তে হয়তো হুহু কান্নায় সশব্দে ভেঙে পড়ে সে, কিন্তু সে-শব্দ শোনা যায় না। সেই শব্দকে ছাপিয়ে দিয়ে ফিরতি ট্রেনের শব্দ ছুটে আসে। গীতালদহের দিক থেকে মান্ধাতার আমলের রেলগাড়ি অসম্ভব শব্দ তুলে ব্রিজের ওপর উঠে পড়ে। নদীর বুকে তুমুল প্রতিধ্বনি তুলে সোজা চলে যায় তীব্র হুইসল বাজাতে বাজাতে। শুধু বসুন্ধরার চোখের জলে সৃজনের শূন্য হাত ভরে যায়।

ছবি : নিতাই ঘোষ



শিশিরকণা ধরচৌধুরী

শিশিরকণা ধরচৌধুরী যন্ত্রসংগীতে বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে খ্যাতনাম্নী। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রসংগীতের প্রধান। সংগীত শিক্ষার শুরুতেই বেহালাকে বেছে নিয়েছিলেন এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর আত্মীয় ওস্তাদ মতিমিঞার কাছে সংগীত শিক্ষার শুরু। পরে ভি. জি. যোগের কাছে সংগীত শিক্ষা নিবিড় সংগীত সাধনায় রূপান্তরিত হয়। শিশিরকণা তাঁর সংগীত-জীবনের সাধনায় অনেক সংগীতগুণীর সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ ও বেহালা বাদন সম্পর্কে স্বকীয় চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে।

● সংগীত জগতে আপনি কি ভাবে এলেন?

শিশিরকণা।। আপনাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে আমার শৈশবে ফিরে যেতে হবে। আমাদের পরিবারে সংগীত-চর্চার রেওয়াজ ছিল। ঠাকুর্দা একজন বিখ্যাত ভাবরসগ্রাহী কীর্তনীয়া ছিলেন। দাদামশায়ের গানও আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। বাবা পেশায় ডাক্তার হয়েও প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সংগীতরসে ডুবে থাকতেন। এছাড়া মায়েরও সুরজ্ঞান এবং অনুরাগ দুইই প্রখর ও প্রবল ছিল।

শিলং-এর স্নিগ্ধ, সুন্দর, মনোরম পরিবেশের সঙ্গে মার্গ সংগীতের ততটা হৃদ্যতা ছিল না। অবশ্য কালক্রমে সেই হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমার শৈশবের শিক্ষাগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর আত্মীয় ওস্তাদ মতি মিঞা। ইনিও আলাউদ্দিন খাঁর মত বাঁ হাতেই বেহালা, এসরাজ,* সেতার, তবলা ইত্যাদি যন্ত্র বাজাতেন। বলতে পারেন শিক্ষানবিশির কালে বাবা মায়ের আগ্রহে বেহালা বাজাতে শুরু করি। এজন্যে মাঝে মধ্যে আমাকে মানসিক যুদ্ধও করতে হয়েছে। আমি মনে করি তখনও আমার সঙ্গে সংগীতের হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমার অক্ষমতা এর জন্যে দায়ী। আমি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম – পড়াশুনা, গান, তবলা, Western music, ছবি আঁকা সবই এক সঙ্গে করতে গিয়ে। প্রতিভার বিকাশ কতটুকু ঘটেছিল তা জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যেদিন বেহালা জগতের দিকপাল পণ্ডিত ভি জি যোগকে গুরু রূপে বরণ করে নেবার সুযোগ এলো সেদিনই বুঝলাম সংগীতকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে হলে চাই কঠোর সাধনা। এই প্রেরণাই পেয়েছিলাম আমার গুরুর কাছে। ষোল/সতেরো ঘণ্টা অভ্যাস করার শ্রমটুকু শেষ পর্যন্ত আনন্দের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল নিজের অজ্ঞাতে। তবে এখন বুঝতে পারি এ শুধু এক জীবনের সাধনা নয়, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার প্রয়োজন। এর শুধু শুরুই আছে শেষ কোথায় এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোন জবাব বড় বড় সংগীতগুণীর কাছেও পাইনি। এ অনন্ত, অসীম এই সত্যটুকুই শুধু জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সাধনা কর সাধনার জন্য, এই মন্ত্র শুধু সামনে রেখে চলেছি। এর পর গুরুজীর কাছে বোম্বাই যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তাঁর অনুমতি নিয়ে বাবা আলি আকবর খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিতে শুরু করি। যন্ত্র-সংগীতের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী এই ঘরানার কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। – সেই সঙ্গে সংগীতের ঔপপত্তিক তত্ত্বের চর্চা শুরু করি পণ্ডিত টি এল রাণার কাছে।

● অনেক যন্ত্রের মধ্যে বেহালা যন্ত্রটিকেই বা বেছে নিলেন কেন?

শিশিরকণা।। সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে বেহালাকেই কেন বেছে নিলাম এ প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। আমাদের পরিবারে সংগীতপ্রিয়তা ও সংগীতচর্চার কথা আগেই বলেছি। এক খাসীয়া ভদ্রলোক ওই কথা জানতে পেরে একদিন একটি ছোট বেহালা বাবার কাছে নিয়ে এলেন বিক্রির জন্যে। বাবা সানন্দে তা কিনে নিলেন। কিন্তু কে বাজাবে এই যন্ত্র? কে বাজাতে জানে? তখন আমি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম নিছক একটি উপহার মনে করে।

বেহালার চর্চা উত্তর ভারতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা কম। অনেকে আমায় বলেন, যেভাবে এই যন্ত্র নিয়ে রেওয়াজ করেছি তা যদি সেতার বা অন্য কোনো জনপ্রিয় যন্ত্রে করতাম তা হলে খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তি দুই প্রচুর হতো। কিন্তু আমি যে বয়েসে এই যন্ত্রের চর্চা শুরু করি, তখন ভাবিনি এই যন্ত্রের বহুল প্রচার হবে কিনা, অথবা জনপ্রিয়তালাভ করতে পারব কিনা?

● বেহালা ছাড়াও তো ঐ জাতীয় যন্ত্রকে প্রয়োজনে ব্যবহার করেন? এতে আপনি সংগীতের কোন দিকটা প্রকাশ করতে চান?

শিশিরকণা।। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাগ সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে এবং টেকনিকের (Technique)-এর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অভাব বোধ করেছি। যার ফলে বেহালার আঙ্গিক কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আবার এমন অনেক রাগ রয়েছে যা প্রকাশ করতে গিয়ে বেহালার fonal quality আমার কাছে অপূর্ণ মনে হয়েছে। যার ফলে আমার মনে হয়েছে এ ক্ষেত্রে viola (বেহালা পরিবারের অন্তর্গত অনুরূপ একটি যন্ত্র) যন্ত্রটির ধ্বনিগাম্ভীর্য রাগ রূপায়ণের অনুকূল। ধ্রুপদী অঙ্গের রাগ বিস্তার করার ক্ষেত্রে আমার কাছে viola যন্ত্রটি বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য এখনও এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

● ভারতীয় পদ্ধতিতে ভায়োলিন-এর হোল্ডিং এবং বোয়িং কিছুটা ভিন্ন হওয়ার জন্য বিদেশে এ যন্ত্রের গুণাবলী যেরকম সম্পূর্ণভাবে পাওয়া সম্ভব তা আমরা এখানে পাচ্ছি না। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শিশিরকণা।। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পৃথিবীতে নানা জাতির ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণের মত সংগীতেরও আছে নানান ধারার সমাবেশ। বেহালা যন্ত্রেও তেমনি ঘটেছে বিচিত্র সুরের



‘ঠোঁটদুটি মোর হাসিমাখা যেন পাকা টুকটুকে চেরীফল,
অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল।’



ল্যাক্‌মে লিপস্টিক।

সবচেয়ে বেশী রকমের রঙের সম্ভার ! মেটালিক্‌স্, গ্লীমার্‌স্ আর এক ধরনের বিশিষ্ট ন্যাচারাল ! আরো মোলায়েম—মসৃণ, আর সবচেয়ে সমান গ্লস। সবচেয়ে সুন্দর ঠোঁটের মিষ্টি হাসির জন্যে — ল্যাক্‌মে !

রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্‌মে। Lakmé

Rediffusion/L/2815a BN

সমাহার। বেহালা এমন একটি যন্ত্র যা পৃথিবীর সমস্ত রকম সংগীতের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া (বিশেষ করে রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে) অন্য সবদেশেই এই যন্ত্র বাজানোর রীতি এক। এখানে কেন Technique বা রীতির পার্থক্য হলো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। সারা ভারতের কথা না বলে কেবলমাত্র দেশের অর্থাৎ আমাদের এই বাংলায় অতীতে এই যন্ত্রে যাত্রাগানে কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সংগীত বাজান হতো। তখন এই যন্ত্র ধরার ভঙ্গীটা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী কায়দায় ছিল। তবে সে যুগে বেহালা অন্যান্য যন্ত্রের মত শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে তেমন স্থান করে নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন আজ এসেছে তা শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন ও প্রকাশের প্রয়োজনে। ভারতীয় সংগীত ভাবধারা অন্য দেশের সংগীত ভাবধারার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কাজেই এই যন্ত্র ধরা বা holding-এ যে পরিবর্তন ঘটেছে তারই ফলে আজ বেহালা যন্ত্রটি গায়নভঙ্গীর কাছাকাছি আসতে পেরেছে এবং একটি সার্থক শৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। তবে bowing-এর পরিবর্তন ঘটেছে সামান্য। সেটাও করতে হয়েছে প্রয়োজন বোধে কখনও fonal quality-কে গায়কীর কাছাকাছি আনার জন্য, কখনও বা তন্ত্রকারীর কথা চিন্তা করে। এই তন্ত্রকারীর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতি বা Technique কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়। তবে বিদেশী সংগীত পরিবেশনের সময় এই যন্ত্রের যেসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে তা অনুপযোগী বলে মনে হয়। এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়।

● সংগীতে আপনি যে ঘরানার অনুসারী তার ধারা বাহিকতা ও অন্য সংগীতগুণী-দের সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা ও সৃজনপ্রতিভা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

শিশিরকণা।। বিংশ শতাব্দীতে ঘরানার ঐতিহ্যকে বহন করার আন্তরিক স্পৃহা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এর জন্যে শিক্ষাকেই একমাত্র দায়ী করা চলে না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশও বেশ কিছুটা দায়ী বলে মনে হয়। আমাদের ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিভূমি হলো আধ্যাত্মিকতা। কালের প্রবাহে মন্দির সংগীত, রাজদরবারে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার বহতা-নদীর মতই স্বচ্ছতোয়া হয়ে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন পর্যায়ে চলে যায়। প্রথমত রেডিও, দূরদর্শন, রেকর্ড, টেপ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগীত আজ অনেক সহজসাধ্য, অনায়াসলভ্য হয়ে পড়েছে। অনেক শিক্ষার্থী আজ এই সুযোগ



গ্রহণ করছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাধীন থাকার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব ঘরানা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পূর্বেই আস্থা অনেকে হারিয়ে ফেলছেন। এসব নানা কারণেই সংগীতের 'ঘরানা'র ধারা বাহিকতায় ছেদ পড়ছে। পুরানো রীতি বা Style ভেঙে নতুন রীতির কোন জোয়ার আসেনি। পুরানোকে আশ্রয় করে সংযোজন ঘটেছে বলা যায়। সংগীতকে ছবি আঁকার প্রথায় বাঁধিয়ে রাখার সুযোগ থাকলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারত। কিন্তু সংগীত হলো dynamic এবং living art. যুগের রুচি অনুযায়ী সংগীত যে পরিবর্তনশীল একথা তো স্বর্গীয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে অকপটে তাঁর লিখিত গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। তবে এই পরিবর্তন কিন্তু ঐতিহ্য বজায় রেখেই হয়েছে এখানে শুধু সৃজন-শীলতাকে উত্তম, মধ্যম, অধম বলে বর্গীকরণ করতে পারি। সার্থক শিল্পী তিনিই যিনি 'ঘরানা'র ঐতিহ্য বজায় রেখে স্বকীয়তায় সৃজনপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন। সংগীত জগতে নিজের আসন চিরস্থায়ী করতে হলে 'ঘরানা'কে আশ্রয় করেই সাধনা করতে হবে।

● আপনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রসংগীত বিভাগের প্রধান। এই শিক্ষা প্রণালীকে কি ব্যক্তিগতভাবে আপনি সম্পূর্ণ বলে মনে করেন?

শিশিরকণা।। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রশ্নে প্রথমেই বলছি যে, সেখানে ঔপপত্তিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মান সমান রয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই শিক্ষা কোনো একটি ঘরানাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারত, যদি ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের ওপর শিক্ষা দেবার ভার ন্যস্ত না থাকত। কিন্তু কখনও তা সম্ভব নয়। এছাড়া এটা সবার কাছে সুস্পষ্ট যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পূর্ব শিক্ষানুযায়ী পরবর্তী course-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে যোগ্যতার বিচার সবসময় সাংগীতিক অর্থে প্রমাণিত হয় না। তবে মাধ্যমিক স্তরে যে সব ছাত্রছাত্রীদের সংগীত একটি বিষয় ছিল, তারা যদি পরবর্তী course অর্থাৎ Pre-degree থেকে ক্রমান্বয়ে সাত বছর M. A. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সংগীতের ভিত্তি অবশ্যই সুগঠিত হবে। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে performing musician হতে হলে বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের Conservatory-তে থাকতে হয়। যেখানে শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার সুযোগ রয়েছে। সেখানে শিক্ষক তাদের অভ্যাসের সময় উপস্থিত থেকে সবসময় ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করেন। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালী এখানে চালু করা সম্ভব নয়। তবুও সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহ ও অভ্যাসের দ্বারা নিজের শিক্ষাকে সার্থক করতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণকে যদি সাধনার ক্ষেত্র বলে মনে করে,তবেই শিক্ষায় যোগ্যতা লাভের অন্তরায় দূরীভূত হবে। ছাত্রছাত্রীদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে তারা ভাবতে শেখেন যে শুধু সংগীত শিক্ষায় উপাধিলাভই শেষ কথা নয়, এ এমন এক শিল্প যা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যোগফল।

● অনেকক্ষেত্রেই মেয়েরা বহু ব্যাপারে অধিকার বঞ্চিত, সংগীতের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

শিশিরকণা।। মেয়েরা সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের উন্নতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে তাঁরা এই আগ্রহকে অনেক ক্ষেত্রে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেন না।

● কোন গায়ক বা সুরস্রষ্টা আপনার কাছে আদর্শ?

শিশিরকণা।। উচ্চাঙ্গ সংগীতকে আশ্রয় করে যাঁরা লঘু সংগীত বা ঐকতান রচনা করেছেন তাঁরা আমার কাছে বরণীয়। শ্রদ্ধেয় তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস, পণ্ডিত রবিশংকর, এঁরা সবাই ঐকতান বাদনে শাস্ত্রীয় ধারার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে জয়দেব, নৌসাদ প্রমুখ গুণী শাস্ত্রীয় সংগীতকে সকল শ্রেণীর শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সহজভাবে। এই প্রচেষ্টা আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আমি মনে করি শাস্ত্রীয় সংগীতের এমন এক নিবিড় বন্ধন আছে যাতে হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না।

সাক্ষাৎকার: গৌতম ঘোষ

ছবি : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়



হেমার দ্বিতীয় সন্তান



হেমা মালিনী আবার সুখ-বন্ধনে বাঁধা পড়ছেন। হেমা তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন জুনের মাঝামাঝি। তাঁর প্রযোজক পরিচালকদের কাছে ব্যাপারটা লুকোতে এতদিন তিনি ঢিলেঢালা পোশাক পরেছেন। আমি ব্যাপারটা প্রথম জানতে পারি হেমার বাড়িতে গিয়ে। আমার সংগে ছিলেন প্রযোজক পরিচালক অশোক খান্না, যিনি তাঁর 'রংগমঞ্চ' ছবির জন্য হেমার সংগে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। হেমা জানালেন জুলাই-এর আগে তাঁর পক্ষে 'ডেট' দেওয়া সম্ভব নয় কারণ প্রসবের জন্য তিনি লন্ডন যেতে চান।

বলতে গেলে ভারতবর্ষে আমিই প্রথম এই খবরটা সংগ্রহ করি। হেমা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মেয়ে এষার জন্য একটি ভাইয়ের ইচ্ছা অনেক দিনের। তাঁকে নাকি কোনো জ্যোতিষী বলেছে যে 'জেমিনি বেবি' (২২ মে – ২১ জুন-এর মধ্যে জন্ম) হেমার ভাগ্যের দরজা খুলে দেবে। হেমা তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ওই সময়ের মধ্যেই আশা করছেন।

এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই হেমা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কারণ লন্ডনে জন্মালে সেই সন্তান ইউ কে-র নাগরিকত্ব পেতে পারে। হেমা এখন খোঁজখবর নিচ্ছেন যে, যদি তিনি সন্তানের জন্য ও দেশের নাগরিকত্ব দাবি না করেন তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লন্ডনে প্রসবের অনুমতি দেবেন কিনা। আগে তিনি ভেবেছিলেন সকলের অজান্তে লন্ডনে চলে গিয়ে ব্যাপারটি সেরে ফেলবেন কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় সন্তান আগমনের আশায় হেমা এবং ধর্মেন্দ্র দুজনই খুশি হলেও একটা অসুবিধা থেকেই যাচ্ছে। হিন্দু আইনে দ্বিতীয় বিয়ে আইনত সিদ্ধ নয় বলে হেমার দুটি সন্তানই অবৈধ হবে আইনের চোখে।

দ্বিতীয় বিয়ের আইনানুগ ধারণাটা অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। ধর্মেন্দ্র-হেমার বিয়ের পর এই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। এমনকি রাজ্যসভায়ও এই প্রসংগ ওঠে। নারী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এবং একটি বিখ্যাত মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী ইউইং দাবি করেন ধর্মেন্দ্রর শাস্তি হওয়া উচিত, কারণ প্রথমা স্ত্রী এবং সন্তান বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। পত্র-পত্রিকায়ও এ নিয়ে খুব লেখালেখি হয়।

ভারতীয় আইনে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রীর সংগে আইনত বিচ্ছেদ না হলে দ্বিতীয় বিবাহ অপরাধ।

ধর্মেন্দ্র কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পরও প্রথমা স্ত্রী প্রকাশ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের সংগে তাঁর বম্বের বাড়িতেই বাস করছেন।

দ্বিতীয় বিয়েতে শুধু পাত্রপাত্রই অপরাধী হন না, পুরোহিত, সাক্ষী সকলেই দোষী সাব্যস্ত হন। আইন অনুযায়ী যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রত্যক্ষদর্শীই বিয়ে চলাকালীন পুলিশে নালিশ করতে পারেন। ধর্মেন্দ্র-হেমার বিয়ের ব্যাপারে নালিশ জানালে তাঁরা দুজনে এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হতে পারতেন।

কিন্তু আইনের ফাঁকও আছে। বিয়ে যদি একবার হয়ে যায়, তাহলে বিবাহিতদের কোনো আত্মীয়, যাঁরা এই বিয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শুধুমাত্র তাঁরাই নালিশ জানাতে পারেন। সুতরাং ধর্মেন্দ্র-হেমার ক্ষেত্রে নালিশ জানানোর মতো ব্যক্তি মাত্র দুজন – ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী প্রকাশ এবং একমাত্র সাবালক সন্তান সানি দেওল। কিন্তু এঁরা নালিশ না জানানোয় ওঁদের শাস্তি হয়নি। তবে এখনো পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র-হেমার বিয়ে আইনসিদ্ধ নয় এবং তাঁদের মেয়ে এষাও বৈধ বলে গণ্য নয়।

এছাড়াও ধর্মেন্দ্র, হেমা বা তাঁর মেয়েকে দানপত্র না করে দিলে ধর্মেন্দ্রর অবর্তমানে তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিতে কোনো অধিকার থাকবে না। এই দানও ধর্মেন্দ্রর স্বোপার্জিত অর্থ বা সম্পত্তি হতে হবে।

এস এন খোসলা

ফটো : শীতল দাস



আউটডোরে অপমানিতা সুমিত্রা



উড়ে আসা খবরমাত্রই উড়োখবর নয়। দার্জিলিং-এ দীপ্তি পাল প্রযোজিত ও জহর বিশ্বাস পরিচালিত 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির আউটডোর শূটিং করতে গিয়ে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় অপমানিত হয়েছেন এ খবর আমরা পেয়েছি। এই ঘটনায় কে দোষী কে নির্দোষ আমরা তা জানি না, আমরা এ ব্যাপারে কোনো পক্ষাবলম্বনও করতে চাই না – শুধু অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্যকে তুলে ধরা হল। তবে এটা ঠিকই শিল্পজগতে আমরা এ ধরনের ঘটনার নিষ্পত্তি চাই। বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন সৃজয় সোম।

হঠাৎই উড়ে এল খবরটা। দার্জিলিংয়ে জহর বিশ্বাসের 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির আউটডোরে অপমানিত হয়ে, শূটিং না করেই কলকাতায় ফিরে এসেছেন অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। তখুনি ফোন করলাম 'হোটেল মিনার্ভা'য়। সুমিত্রার স্বামী রবীন্দ্রনাথ মালহোত্রা ওরফে মামাজী বললেন, 'উই আর রিয়েলি ট্রু-উ-উ শকড। বিকেলে চলে আসুন। হাসির কাছেই সব শুনবেন।'

গিয়ে দেখি হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত সুমিত্রা কেমন যেন ম্লান, বিমর্ষ, বিষণ্ণ।

'আমার মা-কে নিয়ে দার্জিলিং শহরে পৌঁছোলাম বারোই এপ্রিল, শুক্রবার, বিকেল চারটে নাগাদ। পরের দিন থেকে আমার কাজ। ডেট আছে কুড়ি তারিখ অবধি। আমাকে 'সূর্যভবনে' উঠতে বলা হলো। ওটা একটা সাধারণ গেস্ট হাউস। অত উঁচুতে বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে থাকতে চাইলাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম মহুয়া উঠেছে 'হোটেল নিউ এলগিনে'। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার জগদীশ পালকে আমার সমস্যার কথা জানিয়ে বললাম, প্লিজ, আপনি গিয়ে প্রোডিউসার-কে বলুন, 'সূর্যভবন'-এর বদলে অন্য কোথাও আমাদের জন্য ব্যবস্থা করতে।

'কাগজে-কলমে প্রোডিউসার যদিও দীপ্তি পাল, সব কিছু তদারকি করছিলেন তাঁর স্বামী দিলীপবাবু। 'সূর্যভবন' থেকে ঘুরে এসে জগদীশবাবু বললেন, আপনার যদি এখানে না পোষায়, দিলীপবাবু বলে দিলেন 'হোটেল ব্রডওয়ে'তে গিয়ে উঠতে। ওখানে আমাদের টেকনিসিয়ানরা আছেন।

'তাঁর কথা শুনে হকচকিয়ে গেলাম! যত দূর জানি, 'হোটেল ব্রডওয়ে'র ডাবল বেড-এর রুম, এই সিজন-এর সময়েই ষাট টাকা। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, একজন চিত্রতারকার পক্ষে সেখানে থাকা মুশকিল। তাই জগদীশবাবু ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান পঙ্কজ দাশকে বললাম, আপনারা কাইন্ডলি আমাদের 'হোটেল নিউ এলগিনে' পৌঁছে দিন। মহুয়া যখন আছে, নিশ্চয়ই ভালো হোটেল। প্রোডিউসার যদি না দেন, আমিই বিল পেমেন্ট করব।

'ওঁরাই তখন আমাদের নিয়ে গেলেন ওই হোটেলে। পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চান-টান সেরে শূটিং-এর জন্য রেডি হচ্ছি, জহর আমাকে বললেন, হাসিদি, দিলীপবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। একটু যদি বাইরে আসেন।

'আমাদের ঘরের সামনের করিডোর-এর শেষপ্রান্তে লাউঞ্জে গেলাম। পাশেই হোটেলের রিসেপশন কাউন্টার। সোফায় গিয়ে বসতেই দিলীপবাবু ভীষণ চিৎকার করে বলে উঠলেন, আপনার এত বড় আস্পর্ধা কী করে হলো, আমাকে জিজ্ঞেস না করেই এখানে এসে উঠেছেন?

'আমি বললাম, আপনার আর্টিস্টদের সুযোগ-সুবিধে আপনি দেখবেন না?

'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু ওটা কী এমন খারাপ জায়গা? আমরা স্বামী-স্ত্রী, সেইসঙ্গে ছবির ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, এমনকি তাপস পালের মতো স্টার অ্যাক্টরও ওখানে আছে। সবাই যদি থাকতে পারে, আপনার অসুবিধে কোথায়?

'দেখুন, এসব ব্যাপারে কারো সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো। সুবিধে-অসুবিধে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া আরেক ফিমেল আর্টিস্ট মহুয়াকে তো এই হোটেলেই রেখেছেন! এখানে ডাবল বেড-এর রুম দুশো পঁচাত্তর টাকা। আমি যখন বেড়াতে আসি দার্জিলিংয়ে, এর থেকেও ভালো হোটেলে উঠি। আফটার অল আমি একজন অ্যাক্ট্রেস। পাবলিক ফিগার। আমার একটা স্টেটাস আছে। প্রেস্টিজ আছে। সস্তার হোটেলে থাকাটা আমার পক্ষে শোভন নয়। নিরাপদও নয়।

'আরো ঝাঁঝিয়ে উঠে দিলীপবাবু বললেন, কিসের স্টেটাস, প্রেস্টিজ দেখাচ্ছেন? আপনি কেমন, কী ক্লাস-এর, কী ক্যারেক্টর-এর, জানি না আমরা? কপালে লেবেল লাগিয়ে স্টেটাস দেখালে তো হবে না! আমি এখানে আপনাকে যে স্টেটাস দেব, সেটা মেনে নিতে হবে।

'আমার তখন চোখ-মুখ লাল। প্রায় কেঁদে ফেলেছি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনোরকমে কান্না চেপে বললাম, আপনি যেমন ব্যবহার করছেন, এই ছবিতে তাহলে তো আর কাজ করা যাবে না!

'যান-যান, আপনি কাজ না করলে বয়ে গেছে। আপনার মতো তৃতীয় শ্রেণীর অ্যাক্ট্রেস চলে গেলে কিস্যু যায় আসে না ইন্ডাস্ট্রির। এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে।

'আর একটা কথাও বললাম না। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলাম। অপমানে, লজ্জায় তখন মিশে গেছি মাটিতে। কিন্তু আশ্চর্য, জহর এই ছবির ডিরেক্টর, ঘটনার সময় সামনে থেকেও একটা কথা বললেন না! গিরিশ, জয়ন্তবাবুরাও চুপচাপ বসে রইলেন! পাশের ঘরে মহুয়া দরজা বন্ধ করেই বসে থাকল!

'ইতিমধ্যে জহর বা দিলীপবাবু চলে গেছেন। হোটেলের বিল মেটালাম। হোটেলের লোকেরাই আমাদের প্লেনের টিকিট, এয়ারপোর্টে যাবার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। চলে আসবার খানিক আগে মহুয়া এসে বলল, কী ঠিক করলে, হাসিদি?' একটা কিছু ডিসিশানে এসো। থাকছ, না কি চলে যাচ্ছ?

'মহুয়ার ব্যবহারে আবার অবাক হলাম: তুই কি বলিস, এই অপমানের পরও আমি এখানে থাকব, কাজ করব? প্রোডিউসারও তো চলে যেতেই বললেন!'

একটানা কথা বলে একটু থামলেন সুমিত্রা। তাঁর চোখ ছলছল করছে। গলা ধরে এসেছে।

'কলকাতায় ফিরে কী করলেন?' জানতে চাইলাম সুমিত্রার কাছে।

'অনুপকুমারকে ফোন করলাম। আমি অভিনেতৃ সঙ্ঘ-র সদস্যা। অনুপদা সঙ্ঘর সেক্রেটারি। এই ছবিতে আমার কো-আর্টিস্টও। অনুপদা আমার কাছে সব শুনে বললেন, তুমি লিখিতভাবে জানাও। দার্জিলিং যাচ্ছি, ফিরে এসে যা করার করব।

'ঘটনার বিবরণ সহ একটা প্রতিবাদপত্র পনেরোই এপ্রিল প্রোডিউসারের ঠিকানায় পাঠালাম। সেই চিঠির কপি পাঠালাম অভিনেতৃ সঙ্ঘ, শিল্পী সংসদ, ফেডারেশন অব ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এবং ইস্টার্ন ইন্ডিয়া

মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনে। ফেডারেশন চিঠি পেয়েই মিটিং ডাকল। চব্বিশে এপ্রিল সন্ধে ছ-টায়, নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর ভিতরে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরির স্কোরিং থিয়েটারে।'

'মিটিং-এর বিবরণটা শুনি।'

'দিলীপ পালের মুখোমুখি হয়ে বাংলা ছবির বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলীরা একবাক্যে ধিক্কার, প্রতিবাদ জানালেন, ভর্ৎসনা করলেন। আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে এরকম সম্মান পাব, ভাবতেও পারিনি। আমি মুগ্ধ, গর্বিত। কে বলে, ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের মধ্যে ইউনিটি নেই?'

'কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?'

'দার্জিলিং থেকে ফেরার প্লেন ফেয়ার, 'হোটেল নিউ এলগিন'-এর বিল, ওই ছবি বাবদ পাওনা সব টাকা এবং আমার মানহানির ক্ষতিপূরণ সহ লিখিতভাবে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে দিলীপবাবু ও দীপ্তি পালকে। সেই টাকা ও চিঠি পাবার খবর আমি ফেডারেশনকে জানালে, 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির কাজ আবার শুরু করতে পারবেন প্রযোজকরা।'

।। ২।।

'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির পরিচালক জহর বিশ্বাসের দেখা পেলাম নিউ থিয়েটার্সে।

'ব্যাপারটা রিয়েলি আনফর-চুনেট। পরিচালক হিসেবে আমি নতুন। ভাবতে খারাপ লাগছে, এমন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার আমার ছবির আউটডোরেই ঘটে গেল। আশা করি, দিলীপবাবু ও হাসিদির মধ্যে শিগ্‌গিরি মিটমাট হয়ে যাবে।

'ঘটনার সময় আগাগোড়া আপনি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটাকে অতদূর এগোতে দিলেন কেন?'

'সামান্য ঘটনাটা যে এতদূর গড়াবে, বুঝতে পারিনি। আচমকা দেখলাম, ব্যাপারটা আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। একদিকে দিলীপবাবু প্রচণ্ড উত্তেজিত, অন্যদিকে হাসিদি হঠাৎই কেঁদে ফেললেন। নিজেকে বড্ড অসহায় লাগছিল তখন। কী করব, কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছিলাম না!'

মহুয়া রায়চৌধুরীকে পেয়ে গেলাম টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। সুজিত গুহর 'অভিমান' ছবির শুটিং-এর ফাঁকে।

'ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই আমাকে দোষারোপ করছেন। সব দোষ যেন আমারই! আমি কেন সেদিন প্রতিবাদ করলাম না, আসলে গোটা ঘটনাটা কী হয়েছিল, খোলাখুলি জানানো দরকার

'কালিম্পংয়ে 'আশীর্বাদ' ছবির শুটিংয়েই খবর পেলাম, দার্জিলিংয়ে আমাদের জন্য ভালো হোটেলে ব্যবস্থা করেননি দিলীপবাবুরা। আমি কী করব, ডিসিশানটা তখুনি নিয়ে নিলাম। প্রোডিউসারদের সঙ্গে দেখা না করেই, সটান চলে গেলাম 'হোটেল নিউ এলগিনে'। আমার স্টেটাস অনুযায়ী তিরিশ টাকা রুম-এর হোটেলে থাকতে পারি না। রাতে দিলীপবাবু যখন এলেন আমার কাছে, তাঁকে বললাম, এই হোটেলের চার্জ আমি পেমেন্ট করব। আপনার বাজেট যে টাকাটা পারমিট করছে, সেটা আমাকে দিয়ে দেবেন। বারো তারিখ শুটিং সেরে সন্ধেবেলা হোটেলে ফেরার খানিক বাদে সুমিত্রা এসে উঠল আমার পাশের ঘরে। ডিনার-এর পর অনেকক্ষণ আড্ডাও হলো। প্রোডাকশনে-এর কেউই সেদিন রাতে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে এলেন না দেখে, অবাক হয়েছিলাম। তেরোই এপ্রিল সকালে চান-টান সেরে মেকআপ করতে বসব, হঠাৎ কানে এল, সুমিত্রা এই হোটেলে এসে ওঠায় দিলীপবাবু ও দীপ্তি পাল ইউনিট-এর কারো কারো কাছে রাগারাগি করেছেন। একটু পরে খবর পেলাম প্রযোজক-পরিচালকরা এসেছেন। আমার ঘরের বন্ধ দরজা ভেদ করে হঠাৎ প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। আমার ঘরে তখন জয়ন্তবাবু, গিরিশ, অসিতদা। অরূপ মেকআপ করাচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হলাম। এই হোটেলের ম্যানেজার বাঙালি, দু-তিনটে বাঙালি পরিবারও রয়েছে, তাঁদের কী ইমপ্রেশন হবে আমাদের সম্পর্কে? তাই গিরিশকে বললাম, দিলীপবাবুদের বলো, ও-ঘরের দরজাটা বন্ধ করে কথাবার্তা বলতে। বাইরে উঁকি মেরে এসে গিরিশ জানাল, ওঁরা কথা বলছেন হোটেলের লাউঞ্জে।'

'যে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলেন ঘরে বসে, সেটা কি মেল ভয়েস-এর? নাকি ফিমেল ভয়েসও?'

'মেল ভয়েসই। একবার খালি সুমিত্রার গলা শুনেছিলাম।'

'চেঁচামেচিটা কতক্ষণ চলল?'

'মিনিট দশেক। তখন আমার শুধু বেস মেকআপ হয়েছে। ওই কিম্ভূত অবস্থায় ঘর থেকে বেরনো যায় না। মেকআপ কমপ্লিট হবার পর সুমিত্রার ঘরে গিয়ে দেখি, ও অঝোরে কাঁদছে।'

ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে রাজেশ্বরী রায়চৌধুরীর বাড়ি। না বলে-কয়ে, এভাবে হুট করে বাড়িতে হানা দেবার কারণ জানতে পেরে রাজেশ্বরী বললেন, 'একজন সিনিয়র অ্যাক্ট্রেস অপমানিত হয়ে চলে আসার পর, আমি রিকাস্ট হয়েছি। ব্যাপারটা লজ্জার, দুঃখের।

'চৌদ্দই এপ্রিল সকালে, তেরোশো বিরানব্বুই সালের প্রথম দিনে নতুন ছবির অফার পেয়ে দারুণ মজা হলো। পরিচালক জহর বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক চেনা-জানা। কোনো দ্বিধা না করেই রাজি হয়ে গেলাম। পরের দিন সকালের ফ্লাইটেই দার্জিলিং রওনা হলাম, সঙ্গে অনুপকুমার।'

'দার্জিলিংয়ে পৌঁছেও কারো কাছে কিছু শুনলেন না? কোনোরকম গন্ধ?'

'সন্ধে পাঁচটা নাগাদ 'হোটেল নিউ এলগিনে' পৌঁছলাম। তখন সব কিছু কোয়াইট নর্মাল। পরের দিন শুটিং করতে গিয়েও কিছু স্মেল করিনি। তার পরের দিন, সতেরো তারিখ ভোরে, ব্রেকফাস্ট-এর ঠিক আগে, হোটেলের লাউঞ্জে বসে কথায় কথায় হেয়ার ড্রেসার অসিতবাবু বললেন, তেমার রোলটা সুমিত্রাদির করার কথা ছিল। তখনো ততটা গুরুত্ব দিইনি। স্বাভাবিকভাবে উনিশ তারিখ অবধি শুটিং করলাম। আর কেউ আমাকে কিছু বলেনওনি। আমিও ন্যাচারেলি প্রসঙ্গটা তুলিনি। দু-একবার খালি মনে হলো, সুমিত্রাদির মতো ওয়েল বিহেভড মহিলার সঙ্গে কী এমন ঘটল প্রযোজকের? ছবিতে একসঙ্গে কাজ করে দেখেছি, বেজায় কো-অপারেশন করেন সুমিত্রাদি। তাই খচখচ লাগছিল।'

'ঘটনাটা ডিটেলে, শুনলেন কবে? কার কাছে?'

'চব্বিশ এপ্রিল সন্ধেবেলা এন টি ওয়ান স্টুডিওতে ফেডারেশন-এর, মিটিংয়ে, সুমিত্রাদির মুখেই। আগে জানলে কিছুতেই অ্যাকসেপ্ট করতাম না রোলটা।'

অনুপকুমারের সঙ্গে দেখা হলো 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে'

'টেলিফোনে সুমিত্রার কাছ থেকে শুনে বলেছিলাম, তুমি রিটিন কমপ্লেন করো। আমি ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত করে আসি। পনেরোই এপ্রিল বিকেলে দার্জিলিংয়ে পৌঁছলাম। সঙ্গে রাজেশ্বরী। গিয়ে দেখি সব কিছু নর্মাল। স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে। যাবার পথে রাজুকে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ইচ্ছে করেই জানাইনি, ব্যাপারটা ওর অভিনয়ে রিঅ্যাক্ট করতে পারে ভেবে। শুটিং করার ফাঁকে ফাঁকে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সুমিত্রা সত্যিই অপমানিতা হয়েছেন। কিন্তু আমি তখন অভিনেতৃ সঙ্ঘ-র সেক্রেটারি হিসেবে শুটিং বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলাম না। কারণঃ এক, ছবির কলাকুশলী বন্ধুরা তাহলে মুশকিলে পড়বেন। তাঁদের আর্থিক ক্ষতি করা ঠিক নয়। দুই, আমি যদি একাই কোনো সিদ্ধান্ত



মহুয়া রায়চৌধুরী অনুপকুমার

নিতাম, সেটা ভুলও হতে পারত। তিন, ছবির কাজ সবে শুরু হয়েছে। কলকাতায় ফিরে সবার সঙ্গে আলোচনা করে ডিসিশন নিতে কোনো অসুবিধে নেই। সেটাই বাঞ্ছনীয়। তখন বন্ধ করে দিলে প্রযোজকেরও আর্থিক ক্ষতি। বাংলা ছবির এই দুর্দিনে সেটাও কাম্য নয়।'

'কলকাতায় ফিরে এসে কী করলেন?'

'ফিরেই শুনলাম, ফেডারেশন সুমিত্রার চিঠি পেয়ে মিটিং ডেকেছে চব্বিশ এপ্রিল। মিটিংয়ে অভিযোগকারিণী, অভিযুক্ত এবং অভিনেতৃ সঙ্ঘ, শিল্পী সংসদ ও সিনে টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির অন্তত শ-চারেক মানুষ সেদিন সভায় উপস্থিত হলেন। সব তরফের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, প্রযোজক লিখিত অ্যাপোলজি চাইবেন সুমিত্রার কাছে। এবং তাঁর কাছে সুমিত্রার যদি কোনো ডিম্যান্ড থাকে, সেটাও মেটাতে হবে।

চব্বিশ এপ্রিলের ফেডারেশন-এর সভার সিদ্ধান্ত একবাক্যে মেনে নিতে রাজী নন অভিনেতৃ সঙ্ঘ-র অন্যতম সহ সম্পাদক বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়।

ভবানীপুর কবরখানায় জহর বিশ্বাসের শুটিং-এর ফাঁকে দেখা হতেই বিপ্লব বললেন, 'সেদিন রেজুলিউশনটা সবাই মেনে নিলেন বলে আমাকেও মানতে হবে, এমন তো নয়। মেনে নেব কেন? ভদ্রলোক সুমিত্রাকে সব টাকা-পয়সা না-হয় দিয়ে দেবেন, ক্ষমা চেয়ে চিঠিও লিখবেন, তাতে কী এসে গেল? ভদ্রলোকের পাস্ট ভাল নয়। ক-দিন বাদে আরেক কাণ্ড করবেন। তাহলে তো আমারও হক থেকে গেল ভবিষ্যতে প্রোডিউসার নিয়ে এসে আর্টিস্টকে অপমান করার। তারপর অ্যাপোলজি চেয়ে নিলেই হবে। দিলীপ— পাল ও দীপ্তি পালকে এখুনি বয়কট করা দরকার। অথবা অন্য কোনো মেজর পানিশমেন্ট দেওয়া যেতে পারে।'

'ওই লিখিত অ্যাপোলজি চাওয়া এবং সুমিত্রার ডিমাণ্ডস মেটানোটাকেই আমরা প্রযোজকের শাস্তি বলে ধরে নিচ্ছি আপাতত। চব্বিশে এপ্রিল ফেডারেশন-এর মিটিং আমিই প্রিজাইড করেছিলাম। গণতান্ত্রিক উপায়ে এই অপ্রীতিকর ঘটনার মীমাংসার দিকে এগিয়েছি।' বললেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

'সেদিনের সভায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। সুমিত্রার আগেও ইণ্ডাস্ট্রির আরো কারো কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল দিলীপ পালের। তাই অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভদ্রলোক সেদিনও এমন কিছু আনপার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছিলেন, সভায় উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল। সব সামলিয়ে, মিটিং চালিয়েছি। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্মানজনক মীমাংসা হবে, আমি খুশি হব।'

।। ৩ ।।

আজাদগড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোডে প্রোডিউসার দম্পতির বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন সকাল আটটা। খুব ঘরোয়া, আন্তরিক ভঙ্গিতে পরিপাটি বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন দীপ্তি পাল। দিলীপবাবু ঘরে ঢুকলেন খানিক বাদে।


বিপ্লব চ্যাটার্জি


রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী


অনিল চ্যাটার্জি


দীপ্তি পাল


জহর বিশ্বাস

নম্র, শান্ত গলায় দিলীপবাবু বললেন, 'ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান এবং দীপ্তি পাল ও আমি দার্জিলিংয়ে পৌঁছলাম নয় এপ্রিল, মঙ্গলবার বিকেলে। আমরা সবাই মিলে থাকব বলে কলকাতা থেকে যে হোটেলটায় অ্যাডভান্স করেছিলাম, সেটা পছন্দ হল না। ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস-এর সেক্রেটারি মিস্টার বানজাল তখন সাজেস্ট করলেন, যেখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল টিম ওঠে গোল্ড কাপ ফুটবল খেলার সময়, সেই 'হোটেল ব্রডওয়ে'তে উঠতে পারি আমরা। গিয়ে দেখলাম খুব ভালো হোটেল। পরের দিন একটা স্পেশাল ব্যবস্থা করলাম 'সূর্যভবনে', — ফর অল আর্টিস্ট, ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান অ্যান্ড প্রোডিউসারস। পাহাড়ের একটু ওপরে, 'হোটেল ব্রডওয়ে'রই অ্যানেকস। ওখানে চার্জ আরেকটু বেশি। তাপস ও মহুয়া বারো তারিখ সন্ধেবেলা এসে 'সূর্যভবনে'ই উঠলেন। তারপর যখন মহুয়া আমার কাছে এসে বললেন, তিনি 'হোটেল নিউ এলগিনে' উঠতে চান, আমি বললাম, ওখানে ডাবল বেড-এর রুম চার্জ চারশো পঁচিশ টাকা পার ডে। দশ দিনে চার হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা একজন আর্টিস্টের স্টেয়িং চার্জ দিতে গেলে শুটিং করব কেমন করে? বাজেট পারমিট করবে না।

'মহুয়া বললেন, যে টাকাটা আমার স্টেয়িং চার্জ ধরা হয়েছিল, সেটা আপনি দেবেন। বাকিটা আমি পেমেন্ট করব।

'সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় দার্জিলিং পৌঁছলেন তেরো তারিখ সন্ধেয়। তিনি 'সূর্যভবনে' উঠতে চাইলেন না। প্রোডাকশন ম্যানেজার সন্দীপ পালকে বললেন, একজন জুনিয়র আর্টিস্টকে যখন ওই ভালো হোটেলে রাখা হয়েছে, আমিও ওখানেই থাকব।

'দীপ্তি পাল তখন সন্দীপবাবু মারফত রিকোয়েস্ট করলেন, আপনি 'সূর্যভবন'-এর অ্যারেঞ্জ-মেন্টস দেখে যান অন্তত। রাতটা এখানেই থাকুন। লেট আস ডিসকাস।

'সে কথা তাচ্ছিল্য করে সুমিত্রা 'হোটেল নিউ এলগিনে' চলে গেলেন।

'পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ ওই হোটেলে গিয়ে সুমিত্রাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে লাউঞ্জে সোফায় বসলাম, সঙ্গে ডিরেক্টর। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এখানে এসে উঠলেন?

'চিৎকার করে সুমিত্রা বলে উঠলেন, মহুয়াকে এখানে রাখা হয়েছে। আমি অন্য কোথাও থাকব না। পাবলিক আমাকে চেনে। আমার একটা স্টেটাস আছে।

'তিনি ওভাবে চিৎকার করে ওঠায় ডিরেক্টরও অবাক। অথচ আমি একেবারে নর্মাল ছিলাম। বললাম, পাবলিক আপনাকে নিশ্চয়ই চেনে। আমাদের প্রোডিউসারদের তো কোনো স্টেটাস নেই। আমরা কন্যাদায়-গ্রস্ত। কিন্তু ডিরেক্টর বা ক্যামেরাম্যানের তো স্টেটাস আছে। তাপস পালকে তো পাবলিক নামে ও চেহারায় চেনে।

'সুমিত্রা বললেন, আমি আদ্দিন ধরে একটা ইগো তৈরি করেছি, স্টেটাস তৈরি করেছি, ওসব ফালতু জায়গায় থাকতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি। আমায় যে অ্যাডভান্স দিয়েছেন, কলকাতায় গিয়ে ফেরত দিয়ে দেবো।

'কিন্তু শুটিংটা তো আপনাকে নিয়েই। এই যে এত বড় টিম নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছি, এত টাকা খরচ হচ্ছে, আপনি যদি চলে যান শুটিং হবে কি করে? আপনাকে নিয়ে ফ্রেম টু ফ্রেম কাজ।

'না, আমাকে যদি এ হোটেলে থাকতে দেন এবং আমার টাকা-পয়সার ব্যাপারে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করেন, তাহলেই কাজ করব। আদারওয়াইজ নট।

'আমি তখন দেখলাম, ব্যাপারটা অন্য দিকে টার্ন নিচ্ছে।'

'সুমিত্রা কি উত্তেজিত ছিলেন?'

'উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। বেশ দাপটের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাকে কীরকম একটা জব্দ করার ইচ্ছা টের পাচ্ছিলাম।'

'সুমিত্রা কি আপনাকে অপমান করেছিলেন?'

'রাগারাগি হয়েছিল, তবে ...... না, সেভাবে কিছু হয়নি। ওই স্টেটাস-এর কথায় আমি খালি হার্ট হয়েছিলাম। তবু চাইছিলাম, ব্যাপারটাকে সেটল করতে। প্রোডিউসার মহিলা। তিনি এসে কথা বললে নিশ্চয়ই সেটলমেন্ট হতো কিছু একটা। 'সূর্যভবন' থেকে দীপ্তি পালকে নিয়ে এসে দেখলাম, শি লেফট দা হোটেল।'

'সুমিত্রা চলে আসার পর আপনাদের সিচুয়েশনটা কী হল?'

'সেদিনের শুটিং হেল্ডআপ হয়ে গেল। তারপর দুপুরের ফ্লাইটেই প্রোডাকশন ম্যানেজারকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম অন্য কোনো অভিনেত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। আনসার্টেনটির মধ্যে পড়ে রইলাম। চৌদ্দ ও পনেরোই এপ্রিল তাপস-মহুয়াকে নিয়ে শুটিং হলো। পনেরো তারিখ সন্ধেবেলা অনুপকুমার ও প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে রাজেশ্বরীকে দেখে হাতে চাঁদ পেলাম।'

'ফেডারেশন-এর মিটিংয়ে কী হল?'

'সুমিত্রা খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করে বললেন, তাঁকে অপমান করা হয়েছে। আমার বক্তব্যও সভাকে জানালাম। যেখানে একজন শিল্পীর সম্মান-অসম্মান নিয়ে এত কাণ্ড, সেখানে শিল্পীমহলকে আমার কথা বলার সময় দেখলাম, কতকগুলো রিমার্ক পাস করতে।

আমি সুমিত্রাকে অপমান করিনি, একথা পরিষ্কার করে বলার পরও, সুমিত্রার পক্ষেই একটা রেজুলিউশন পাস হল।'

'এখন কী ভাবছেন আপনারা?'

দীপ্তি পাল হৈ-হৈ করে বলে উঠলেন, 'সুমিত্রা যদি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চান, আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? সিনেমা আমার মেন বিজনেস নয়। কিছুটা শখ মেটাতেই এই জগতে এসেছি। তা বলে একজন অভিনেত্রীর স্পর্ধা কতদূর মেনে নেওয়া যায়, বলুন? তিনি আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন, আমাদের বিপদে ফেলে চলে এলেন। তারপর কলকাতায় এসেই আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসলেন। এভাবে সত্যিকে চাপা দেওয়া যায় না। নিজের ওজন কতটা, সেটা জানেন না সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়!'

রবীন্দ্রসদনে শিশু উৎসব

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বছরের মতো এবারেও চারদিনব্যাপী শিশু উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ৬ থেকে ৮ এপ্রিল। সব মিলিয়ে পাঁচটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান। নাচ-গান, আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যনাট্য, পুতুলনাচ, ম্যাজিক – বাচ্চাদের ভালো লাগার মতো সব আয়োজনই ছিল। এ কদিনে আমরা পেলাম শিশুদের এবং বড়দেরও ভালো লাগার মতো কিছু প্রযোজনা। সন্ধান পেলাম প্রতিভাবান বেশ কিছু শিশুশিল্পীর। তবে সময়টি কর্তৃপক্ষ ঠিক বাছেননি। বাচ্চাদের স্কুল ছুটির সময় করলে আরও ভালো হত। প্রেক্ষাগৃহও থাকতো পূর্ণ।

৬ এপ্রিল সকালবেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান। পরিচালনা করলো শিশুরাই। ছোট্ট সভাপতি, ছোট্ট প্রধান অতিথি, এমনকি ছোট্ট ঘোষকও। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করলো শিশুরঙ্গন-এর শিশুশিল্পীরা। এরপর ছিল গল্প-বলার আসর। গল্প শোনাতে এসেছিলেন শিশুদের পরমপ্রিয় লেখকেরা – অখিল নিয়োগী, শৈল চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শৈলেন ঘোষ। স্বভাবতই অনুষ্ঠানটি জমে উঠেছিল।

ওইদিন সন্ধেবেলায় ছিল রাগিণী প্রযোজিত তিনটি নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যগুলি অতি পরিচিত সব রচনা থেকে নেওয়া – সুনির্মল বসুর 'সামিয়ানা', সুমথনাথ ঘোষের 'বুড়ীর কৌটো' ও সুখলতা রাও-এর 'গরীব মুচি'। নাট্যরূপ ও সংগীত পরিচালনা জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। নির্দেশনা ও নৃত্য পরিচালনায় অসিত চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যনাট্য, যেখানে কথোপকথন গানের মাধ্যমে বলা, সেখানে গানের কথা পরিষ্কার করে শোনানো একটি প্রাথমিক কর্তব্য। রেকর্ডিং-এর ত্রুটির জন্য গান প্রায় বোঝাই যায়নি। নির্দেশক অনেক ছেলেমেয়েকে মঞ্চে হাজির করিয়েছেন। কিন্তু 'সামিয়ানা' ও 'বুড়ীর কৌটো' একবারেই জমলো না। শিশুশিল্পীদের জন্য কষ্ট হয়। তাদের তো দোষ দেবার কিছু নেই। তুলনায় 'গরীব মুচি' কিছুটা ভাল। প্রথম দৃশ্যেই সার্কাস, জোকার, জিমন্যাস্ট, ফেরিওয়ালা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে প্রবেশ করিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা হয়েছে। শিশু দর্শকরা তাতে চমৎকৃতও। কিন্তু ব্যাপারটি প্রক্ষিপ্ত, মূল গল্পের সঙ্গে যোগ নেই। এরকম দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যায়। যেমন ব্যালের ঢঙে বাচ্চা মেয়েদের দীর্ঘ, অনাবশ্যক নাচটি। অনেকগুলি বাচ্চা মেয়েকে এরকম সাদা পোশাক পরিয়ে মঞ্চে হাজির করলে দেখতে প্রথমটা ভালই লাগে। কিন্তু অনুশীলন যদি ঠিক না হয় তবে ফাঁকিবাজিটা ধরা পড়তে দেরি হয় না। তবে অসম্ভব ভালো লাগল বাচ্চা মেয়ে দুটিকে। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় গানের সুরগুলি ভাল দিয়েছেন কিন্তু সেই রেকর্ডিং-এর ত্রুটি সব নষ্ট করে দেয়।

৭ এপ্রিল সকালে বসেছিল সংগীত ও আবৃত্তির আসর। অনুষ্ঠানটি দীর্ঘ। তার ফলে শেষের দিকে দর্শকদের অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। শিশুদের ওপর এটা অবিচার করা হয়। যাই হোক, সেদিন আমরা অনেক প্রতিশ্রুতিময় শিশু, কিশোর-কিশোরীকে পেলাম। শ্রাবণী মজুমদার, মনোময় ভট্টাচার্য, শৌভিক ঘোষ, অর্পিতা চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই চমৎকার গান বা আবৃত্তি করে। ঠিকমতো অনুশীলন ও অধ্যবসায় এদের ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হবার পাথেয় যোগাবে। কিন্তু সেদিন আমাদের অবাক করে দিয়েছে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। যে প্রতিভার পরিচয় সে দুটি গানে, বিশেষ করে 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে'-তে রাখল তাতে করে সে নিজেকে যদি ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে (অবশ্যই সে যদি এরকম অনুশীলন চালিয়ে যায়) তবে সে দোষ তার নয়, সে দায়িত্ব বড়দের, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের। অপর্ণা সেনগুপ্তর আবৃত্তি সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যায়। শিশুদের আসরে দুজন বড় শিল্পীও ছিলেন। গৌরী ঘোষ ও প্রদীপ ঘোষ আবৃত্তি শোনালেন বাচ্চাদের। গৌরী ঘোষ কিন্তু তাঁর পরিশীলিত বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ নিয়েও বাচ্চাদের কাছে পৌঁছতে পারলেন না। বিশেষ করে সুকুমার রায় তাঁর কণ্ঠে বাঞ্ছিত চেহারা পেল না। প্রদীপ ঘোষ বাচ্চা, বড় সবাইকে জয় করে নিলেন। তাঁর কণ্ঠে সেদিন সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আল মাহমুদ, নরেশ গুহ সবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 'ছোটোং ছেলে চড়েং ঘোড়া'-র তো জবাব নেই।



ছুদে যাযাবর ইসতাসি

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কিশোর ম্যাজিসিয়ান পিটার প্যান তার ম্যাজিক দেখাল। পিটার প্যান চার বছর বয়স থেকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। কিন্তু তার খেলাগুলি পরিষ্কার নয়। প্যাটার্নও ভাল না। যাই হোক, কিশোর ম্যাজিসিয়ানের খেলা বাচ্চারা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছে।

৭ এপ্রিল সন্ধ্যের অনুষ্ঠান শিশুরঙ্গন-এর নিবেদন শৈলেন ঘোষের নাটক 'ছুদে যাযাবর ইসতাসি'। শৈলেন ঘোষ আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। 'ছুদে যাযাবর ইসতাসি'-র প্রথম পর্বটি আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। যেমন জমজমাট নাটক, তেমনি মঞ্চ, আলো, তেমন নাচ-গান-অভিনয়। আবার পুতুল নাচও ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিনয়ে রাজার ভূমিকায় মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় একাই একশো। অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা। সেনাধ্যক্ষ নিতাই মিত্রও ভাল অভিনয় করেছে। ইসতাসি ও রাজপুত্র-র ভূমিকায় ইন্দ্রনীল দত্ত ও অর্ণব ধর ভালো করেছে তবে চেঁচিয়ে কথা বলার জন্য দুজনেরই গলার ওপর জোর পড়ে। আর সত্যিই অসাধারণ ও কষ্টসাধ্য অভিনয় করেছে ভাল্লুকের ভূমিকায় সত্যনারায়ণ দত্ত। তার হাঁটাচলা, দাঁড়ানো, বসা সবই অবিকল ভাল্লুকের মতো। সংগীত পরিচালক উৎপলেন্দু চৌধুরীও বেশ ভালো কাজ করেছেন।

শুরুতে হরবোলার অনুষ্ঠানে শুভেন্দু বিশ্বাস ও রাধাবল্লভ পাল বাচ্চাদের একেবারে মাতিয়ে দেন।

৮ এপ্রিল সন্ধেবেলায় ছিল শেষ অনুষ্ঠান। লিটল পাপেট থিয়েটারের 'আলিবাবা' পুতুল নাটকের পরিকল্পক-পরিচালক সনজিৎ ঘোষ চিরপরিচিত উপকথাটিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আলিবাবা, কাশেম, মর্জিনা, আবদাল্লার গল্পের মধ্যে তিনি সারা পৃথিবীর বঞ্চিত, শোষিত মানুষের মুক্তির কথাও শুনিয়েছেন। দুনিয়ার সব সম্পদ একসঙ্গে সবাই ভাগ করে নেওয়ার গান গেয়েছেন (নাট্যরূপ : ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য)। দু-একটি দৃশ্য বা গানের ভেতর দিয়ে এই ভাবনাটিকে এমন সূক্ষ্মভাবে ঢোকানো হয়েছে যে কখনই তা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়নি।

নেপথ্য কণ্ঠে কুমার রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, চিরঞ্জীৎ, মীনাক্ষী গোস্বামী প্রভৃতি নামী শিল্পীরা আছেন। প্রত্যেকেই সুনাম অনুযায়ীই অভিনয় করেছেন।

পার্থ সেনগুপ্ত



ঝর্না দত্ত

'পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি আমাদের সমাজের মনোভাব এখনো এক নয়, তাই যে কোনো পেশাতেই থাকুন না কেন মহিলারা সবসময়ই পুরুষদের থেকে একটু অন্যরকম হন।'

এই মন্তব্য করেন শ্রীমতী ঝর্না দত্ত, ডি ভি সির পারচেজ ডিপার্টমেন্টে যিনি একজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সকলেই পুরুষ এবং পারচেজ ডিপার্টমেন্টের অন্যতম কাজ 'টেন্ডার'-এর জন্য তাঁর লেনদেনও সবসময়ই পুরুষদের সংগে। এত বছরের চাকরি জীবনে কাজের খাতিরে শুধু একবারই তাঁর কাছে একজন মহিলা এসেছিলেন।

সর্বদা পুরুষের সংগে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় কি?

'না সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। অফিসের সহকর্মীদের কাছ থেকে কোনো বাধা আসে না। কাজেরও কোনো তারতম্য নেই। বাইরের লোকেদের সংগে কথাবার্তা বা কাজের লেনদেনে কখনো কোনো পার্থক্য অনুভব করিনি। তবুও আমি মহিলা বলেই বোধহয় আমার কাজের ফাঁকেও বাড়ির চিন্তাটা থেকেই যায়। আজকের মহিলারা পুরুষদের সংগে সমান তালে উপার্জন করলেও সংসারের দায়িত্বটা সমানভাগে ভাগ হয় না। দায়িত্বটা আমাদেরই, তবে ভাগ্য ভাল হলে কোনো কোনো বাড়ির পুরুষরা হয়তো একটু সাহায্য করেন। পুরুষদের এই দৃষ্টিভংগি না বদলালে আমাদের দেশের মেয়েদের কাজের বোঝাটা বেড়েই যাবে।'

নিজের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, 'খুব সাধারণ স্কুলেই পড়াশুনা করেছি। তবে প্রথম যে স্কুলে পড়তাম সেটা ছাড়তে হয়েছিল, কারণ বোর্ড সে বছর আমাদের স্কুলকে বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমতি দেয়নি। বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হলাম এবং ১৯৬৩ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করি। তারপর বেংগল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (শিবপুর) পাঁচ বছর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। তখন তো সব বিভাগে মেয়েদের পড়তে দেওয়া হত না। কম্প্যুটার সায়েন্স আরম্ভ হয়নি, আর্কিটেকচার এবং ইলেকট্রিক্যাল এই দুটোতেই মেয়েরা পড়তে পারত। আমাদের সময় সব মিলিয়ে মাত্র তেরোজন মেয়ে ছিল, তার মধ্যে আমাদের বিভাগে দুজন। এখন তো প্রায় একশোজন মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।

'শুনলে অবাক হবেন, বি ই কলেজ সবচেয়ে পুরনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলেও এখানে প্রথম একশো বছরে কোনো মেয়ে ঢোকার অনুমতি পায়নি। শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনে জওহরলাল নেহরু প্রথম মেয়েদের পড়ার প্রস্তাব দেন। তারপর থেকে মেয়েরা পড়ার সুযোগ পান। প্রথম বছর একজন মাত্র মেয়েই পাশ করেন। এরপরে কিছুকাল আবার মেয়েদের পড়া বন্ধ থাকে। ১৯৬১ থেকে নিয়মিত মেয়েরা পাশ করে বেরিয়ে আসছেন।

'আমি পাশ করার পর খড়্গপুরে কমপ্যুটার নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি, কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝতে পারি ওটা পাশ করলে আমার বাইরে চাকরি করতে হবে। অথচ আমি একটু হোম-সিক, তাছাড়া মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না, নানা অসুবিধা আছে। আর সেই সময় ডিভিসিতে চাকরিটাও পেয়ে গেলাম, তাই পড়াটা ছেড়ে দিলাম। আমার এই চাকরিটা বাংলা, বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বদলির চাকরি হলেও পনের বছরের মধ্যে এই 'ভবানী ভবন'-এর বাইরে যাইনি। চার বছর আগে শুধু একবার ডিপার্টমেন্ট বদল হয়েছে।

'এর আগে কাজ করতাম ডিজাইন ডিপার্টমেন্টে। আমি যখন প্রথম চাকরিতে জয়েন করি তখন চন্দ্রপুরা পাওয়ার স্টেশনের ফোর্থ ইউনিটের ডিজাইনের কাজ চলছিল। তারপর দুর্গাপুর ইউনিটের ডিজাইন করেছি। পারচেজ ডিপার্টমেন্টে এসেছি চার বছর। এখান থেকে ডিভিসির টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম সবকিছু কেনার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য সবই টেন্ডারের মাধ্যমে।'

বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার একটি অভিজাত ফ্ল্যাট-বাড়ির বাসিন্দা শ্রীমতী দত্তর বিয়ে হয়েছিল ১৯৭৫-এ। এখন দুই ছেলের জননী। স্বামীও ইঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা টেলিফোনস-এ কর্মরত।

সংসার এবং অফিস এক সংগে সামাল দিতে কোনোরকম অসুবিধা?

'দুটো কাজ একসংগে করতে গেলে চাপ একটু বেশি পড়বেই। অফিসের কাজে তো কোনো ত্রুটি রাখা চলেই না, আবার সংসারের দায়িত্বও আমার। কোনো পুরুষ যখন অফিসে বেরোন, তখন তাঁকে কখনোই ভাবতে হয় না যে তিনি যেটুকু সময় বাড়িতে থাকবেন না সেটুকু সময় বাড়ির কী হবে। আমাকে কিন্তু সেটা ভাবতে হয়। যতক্ষণ অফিসে থাকব সে সময়ে বাড়ির সব কাজের ব্যবস্থাই আমাকে করে রেখে যেতে হবে। রান্না, সকলের খাওয়া, ছেলের স্কুল যাওয়া-আসা প্রতিটির ব্যবস্থাই আমার। অবশ্য কাজের লোক বা স্বামীর সাহায্য পাই, তবুও দায়িত্বটা আমারই। যেমন ধরুন, কাজের লোক না এলে ছেলে কার সংগে ফিরবে, এসে ঠিক মতন খাবে কিনা সেটাও কাজের ফাঁকে বাড়িতে ফোন করে জেনে নিই। এ ব্যাপারে বাড়ির আত্মীয়-স্বজন থাকলে ভাল। আমার বড়ছেলে যখন ছোট ছিল তখন শ্বশুর-শাশুড়ি জীবিত থাকায় ওর দেখা-শোনার জন্য আমি ওঁদের উপর নির্ভর করতে পেরেছি। কিন্তু ছোটছেলেকে তিনমাস বয়স থেকেই ক্রেশে রাখতে হয়েছে এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ও ক্রেশেই থাকে। এইভাবে সংসারের সবদিক সামাল দিয়ে চলতে হয়। আমার তো মনে হয় এটা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসর বা যেকোনো ধরনের পেশার মহিলাকেই করতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আর পারছি না, তবুও কোনোটাই তো ছাড়া যায় না।

'আমি বুঝি কষ্ট হয়, তবুও চাই মেয়েরা আরো বেশি উপার্জনের রাস্তায় এগিয়ে আসুক। এখনকার চাকরিরতা মহিলারা হয়তো মুখে বলেন, আমার মেয়েকে কখনো চাকরি করতে দেব না কিন্তু সেটা মনের কথা নয়। প্রতিটি মহিলাই মনে মনে চান মেয়েদের অগ্রগতি। আমি মনে করি মেয়েরা এগিয়ে এলেই পুরুষদের দৃষ্টিভংগির বদল হবে। তখন হয়তো মেয়েরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিজেকে আরো ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সেই দিনের বোধহয় খুব বেশি দেরিও নেই।'

ঝুমুর কুশারী

ছবি : ইন্দ্রজিৎ মিত্র

'ক্রিং ... ... ক্রিং ... ... ক্রিং' ফোনটা তুলতেই আমার অফিসের টেলিফোন অপারেটর বললেন – 'রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আপনাকে চাইছেন –।' 'মেয়েদের কর্মসংস্থান' সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিলো দূরদর্শনের পর্দায়। প্রোগ্রামের অনুমতি পেয়ে গেলাম টেলিফোন যন্ত্র তথা 'টেলিফোন অপারেটর' মারফত।

'টেলিফোন অপারেটর' বলতে সাধারণত আমাদের মনে একজন সুন্দরী মহিলার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে যেন। মেয়েদের পক্ষে নার্সিং যেমন একচেটিয়া, টেলিফোন অপারেটিং প্রায় তাই। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে – মহিলারা যতরকম পেশায় নিয়োজিত, তার শতকরা দুভাগেরও বেশি 'টেলিফোন অপারেটর' হিসেবে কাজ করেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগই হচ্ছে বেশির ভাগ টেলিফোন অপারেটরের নিয়োগকর্তা। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৪,৪৪১টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছিল। বারো বছরে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই তিন-চার গুণ বেড়েছে। সেই অনুপাতে টেলিফোন অপারেটর নিয়োগও হয়েছে।

'টেলিফোন অপারেটর' কেবল সরকারি অফিসেই চাকরি পান না – বেসরকারি সংস্থায়ও টেলিফোন অপারেটরের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁকে অনেক সময় 'রিসেপশনিস্ট' হিসাবেও কাজ করতে হয়। সেইজন্য 'দূরভাষিণী' সুশ্রী হলে ভাল হয়।

সুইচ বোর্ড অপারেট করা, ট্রাঙ্ককল বুক করা, নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রভৃতি হচ্ছে একজন টেলিফোন অপারেটরের প্রধান কাজ। তাঁদের তিন ধরনের কাজে নিয়োগ করা হতে পারে – (১) লোকাল কল, (২) ট্রাঙ্ককল এবং (৩) PBX.

(১) টেলিফোন অপারেটর (লোকাল কল) – লোকাল গ্রহীতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ। সুইচবোর্ডে সংকেত দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, একজন গ্রহীতা অন্য নম্বর চাইছেন। তখন তিনি নির্দিষ্ট জ্যাকে প্লাগটি ঢুকিয়ে দিয়ে Speak Key-তে চাপ দেন এবং বলেন, Number please…।

(২) টেলিফোন অপারেটর (ট্রাঙ্ক কল) – দূরস্থিত গ্রহীতাদের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য একটি টেলিফোন সুইচবোর্ড কন্ট্রোল ও অপারেট করেন। তিনি ট্রাঙ্ককল



টেলিফোন অপারেটর

বুক করেন। তাছাড়াও কল নম্বর, কলের ধরন – অর্থাৎ কলটা আর্জেন্ট না লাইটনিং ইত্যাদি লিখে রাখেন। তারপর ট্রাঙ্ককল টিকেট পাঞ্চ করেন এবং মিটারের মাধ্যমে সময় রেকর্ড করেন। প্রতি তিন মিনিট অন্তর প্রয়োজন হলে সময় বাড়িয়ে দেন।

(৩) টেলিফোন অপারেটর (PBX/PABX) – সাধারণত সরকারি, বাণিজ্যিক প্রভৃতি সংস্থায় PBX (Private Branch Exchange) অথবা PABX (Private Automatic Branch Exchange)-এ সুইচবোর্ড অপারেট করাই হল এই শ্রেণীর দূরভাষিণীর কাজ। তিনি incoming অথবা outgoing কল ঠিক ঠিক মতো অপারেট করেন এবং অফিসের মধ্যেও যোগাযোগ ঘটান টেলিফোন যন্ত্র মারফত।

বেশিরভাগ টেলিফোন অপারেটরকে odd hours-এ কাজ করতে হয়। বাণিজ্যিক সংস্থায় টেলিফোন অপারেটরকে অবশ্যই সুশ্রী হতে হয়। সরকারি অফিসে চল্লিশোর্ধ হলেও ক্ষতি নেই। এমনকি, দৈহিক প্রতিবন্ধী – অর্থাৎ দৃষ্টিহীনা বা বিকলাঙ্গ হলেও চলে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারে বা রেলওয়েতে বহু দৃষ্টিহীনা মহিলার চাকরি হয়েছে। টেলিফোন ভবনে বা গার্ডেনরিচ রেল-অফিসে গেলেই দেখতে পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে, 'টেলিফোন অপারেট' পেশাটি মহিলাদের একচেটিয়া হয়ে গেছে। এবার জানা দরকার এরজন্য কি কি যোগ্যতা লাগে। বলছি শুনুন :

(১) মাধ্যমিক/উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ।

(২) টেলিফোন অপারেটিংয়ে দু'মাসের প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং।

(৩) ধৈর্য, ভদ্রতাজ্ঞান, মানসিক সজাগ-ভাব।

(৪) স্বাস্থ্যবতী (কারণ, 'নাইট ডিউটি'ও করতে হতে পারে)।

টেলিফোন অপারেটরকে আট ঘণ্টার, 'সিফট ডিউটি' করতে হয় প্রতিদিন – সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা। রাত্রে কাজ করলে ৩৬ ঘণ্টা সপ্তাহে। নাইট ডিউটির পর নিদ্রা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকে ডর্মেটরিজে।

টেলিফোন অপারেটর থেকে 'মনিটর' বা সুপারভাইজরের পদে প্রমোশন হয়।

এই পেশার বেতনহার :

(১) টেলিফোন অপারেটর –

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার – ২৬০ – ৮ – ৩০০ – ৮ – ৩৪০ – ১০ – ৩৬০ – ১২ – ৪৮০ টা+ডি এ

(খ) রাজ্য সরকার – (i) ৩০০ – ১০ – ৪০০ – ১৫ – ৫৬৫ – ২০ – ৬৮৫ টাকা+ ডি এ (জুনিয়র)

(গ) রাজ্য সরকার – (ii) ৩৮০ – ১৫ – ৫০০ – ২০ – ৭০০ – ২৫ – ৮৫০ – ৩০ – ৯১০+ডি এ (সিনিয়র)

কেন্দ্রীয় সরকারে সুপারভাইজর পদে প্রমোশন হলে : ৪২৫ – ১৫ – ৫০০ – ১৫ – ৫৬০ – ২০ – ৬৪০ টাকা+ডি এ।

সিনিয়র সুপারভাইজর পদে প্রমোশন হলে : ৫৫০ – ২৫ – ৭৫০+ডি এ।

প্রাইভেট ফার্মে বা বাণিজ্যিক সংস্থায় একজন 'দূরভাষিণী' ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত মাইনে পেতে পারেন।

সুতরাং 'টেলিফোন অপারেটিং' শিখুন এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করে রাখুন। এ বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন হলে Dte. of Employment-এ পত্রালাপ করুন বা দেখা করুন :

Vocational Guidance Section.
67, Bentinck Street, (4th floor) Calcutta-69

অথবা

Deputy Chief,
University Employment Information & Guidence Bureau (Administrative Building)
Jadavpore University,
Calcutta-32

অসিতকুমার চৌধুরী

(পরের সংখ্যায়
–W.B.C.S.)

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১৬ – ৩১ মে ১৯৮৫

মেষ : অযথা পারিবারিক অশান্তি ও বিরোধ। অর্থকষ্ট, কর্মক্ষেত্রে ভয় ও শত্রুতা বৃদ্ধি। বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা বা দুর্নাম রটতে পারে। শুভ তারিখ – ২৪ ও ৩০। মেষ লগ্নের জাতিকার মানসিক অশান্তি থাকবে। রক্তচাপ বা চর্মরোগে কষ্ট পাবার যোগ আছে। ৯ বৎসরের নিচে সন্তানের রক্তপাত যোগ আছে।

বৃষ : এ পক্ষটা মোটামুটি শুভই কাটবে। যেচে পরোপকারের ফলে ক্ষতি হতে পারে। অর্থ ও কর্মক্ষেত্রে সংকট দেখা দিতে পারে। বন্ধু বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের ক্ষেত্রে অযথা কষ্ট দেওয়া সম্পর্কে সাবধান। শুভ তারিখ – ১৮, ২০, ২৩ ও ২৬। বৃষ লগ্নের জাতিকার কোনো ব্যক্তির সুপরামর্শে কোনো ঝামেলা কেটে যেতে পারে।

মিথুন : পারিবারিক দুর্ভাবনায় মন চঞ্চল হবে। স্বামী-স্ত্রীতে হঠাৎ মন কষাকষি হতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা ক্ষতির চেষ্টা হতে পারে। মানসিক আঘাত পেতে পারেন। শুভ তারিখ – ১৮, ১৯ ও ২৫। মিথুন লগ্নের জাতিকার শারীরিক কারণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সুনামবৃদ্ধি। সদ্‌গুরুর কৃপায় বিশেষ কোনো বিপদ কেটে যেতে পারে।

কর্কট : পারিবারিক শান্তি। অর্থসংকট কেটে যাবে এবং সচেষ্ট হলে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। অপরদিকে বন্ধুস্থানীয় কারো কাছ থেকে উপকৃত হতে পারেন। কর্ম ও ব্যবসায় সুনামবৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ – ২২, ২৫ ও ৩১। কর্কট লগ্নের জাতিকার পূর্বের তুলনায় সর্বক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়। তবে মানসিক চঞ্চলতা থাকবে।

সিংহ : বায়াধিক্যের চাপে পারিবারিক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। শত্রুবৃদ্ধির যোগ প্রবল। শুভ তারিখ – ১৬ ও ২৩। সিংহ লগ্নের জাতিকার আত্মীয় বিরোধিতার জন্য মানসিক অশান্তি বাড়তে পারে। স্বামীর সঙ্গে অযথা মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।

কন্যা : পারিবারিক অশান্তি চলবে। বায়াধিক্যের চাপ থাকবে, তবে সম্মানবৃদ্ধির যোগ আছে। নিকট জনের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পাবার যোগ আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে বদনাম হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৬, ২২ ও ২৫। কন্যা লগ্নের জাতিকার মানসিক অশান্তি চলবে।

তুলা : পূর্বের পারিবারিক ঝামেলা অনেকটা কেটে যাবে, তবে মানসিক অশান্তি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর দ্বারা ক্ষতির চেষ্টা চলবে। একগুঁয়েমি ও কল্পনাপ্রবণ মনোভাব ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখ – ১৯, ২৬ ও ২৯। তুলা লগ্নের জাতিকার বন্ধুবৃদ্ধির যোগ আছে।

বৃশ্চিক : আগের তুলনায় পারিবারিক শান্তি, তবে মাঝে-মধ্যে কলহের যোগ আছে। হঠাৎ কিছু প্রাপ্তি ঘটতে পারে। শত্রুরা বদনাম রটাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। শুভ তারিখ – ২৩, ৩০ ও ৩১। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকার ভাইবোনের সঙ্গে মতবিরোধ ও সন্তানের রক্তপাত যোগ আছে।

ধনু : শারীরিক ও আর্থিক কারণে মানসিক অশান্তি চলবে। বন্ধুস্থানীয় কারো কাছ থেকে উপকৃত হতে পারেন। সচেষ্ট হলে নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা আছে। অন্যকে ভুল বুঝে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। দিবাস্বপ্ন ও স্পর্শকাতরতা ত্যাগ না করলে ক্ষতির যোগ আছে। শুভ তারিখ – ১৬, ২৮ ও ৩১। ধনু লগ্নের জাতিকার মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। অপরের ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

মকর : পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধির যোগ আছে। স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব বজায় রাখা কঠিন হবে। সন্তানের জন্য পূর্বের চিন্তা অনেকাংশে দূর হবে। শুভ তারিখ – ২৪, ২৫ ও ৩০। মকর লগ্নের জাতিকার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর শত্রুতায় সুনামহানির যোগ আছে।

কুম্ভ : বায়াধিক্যের চাপে পারিবারিক ও মানসিক অশান্তি চলবে, তবে সচেষ্ট হলে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শুভ তারিখ – ১৯, ২০, ৩০ ও ৩১। কুম্ভ লগ্নের জাতিকার নিকট আত্মীয়ের সুপরামর্শে আর্থিক সংকট ও মানসিক দুর্ভাবনা দূর হবে।

মীন : বৈষয়িক সমস্যায় মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কোনো সৎ ব্যক্তির সুপরামর্শে বিশেষ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ও ভয়বৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ – ২৬, ২৮ ও ২৯। মীন লগ্নের জাতিকা সময় থাকতে সাবধান না হলে কোনো বন্ধুস্থানীয় লোকের কুপরামর্শে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

শ্রীগৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

মঞ্চ

১৬ মে : রবীন্দ্রসদনে রাগিণী সংস্থার নৃত্যনাট্য শাপমোচন, আকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক।

১৭ মে : রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পাঠের আসর, অ্যাকাডেমিতে নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের নাটক

১৮ মে : রবীন্দ্রসদনে নৃত্যাঙ্গন সংস্থার নৃত্যনাট্য শ্যামা, অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান।

১৯ মে : রবীন্দ্রসদনে সকালে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র, স্বদেশ ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানের আসর – সন্ধ্যায় আগামী সংস্থার নৃত্যনাট্য তাসের দেশ, আকাডেমিতে সকালে পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত নাথবতী অনাথবৎ

২০ মে : রবীন্দ্রসদনে পূজা পর্যায়ের গানের আসর, অ্যাকাডেমিতে সমকালীন শিল্পীদল গোষ্ঠীর নাটক।

২১ মে : আকাডেমিতে চেতনা গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাঙ্গনে রঙ্গন-এর নাটক, বিজনে নাট্যরঙ্গ গোষ্ঠীর নাটক।

২২ মে : রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানের আসর, অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান।

২৩ মে : রবীন্দ্রসদনে মণিপুরী নর্তনালয়-এর নৃত্যনাট্য ভানুসিংহের পদাবলী।

২৪ মে : আকাডেমিতে চেনামুখ-এর নাটক, শিশির মঞ্চে প্রগ্রেসিভ কালচারাল সেন্টার সংস্থার নৃত্যনাট্য

২৫ মে : রবীন্দ্রসদনে সদন আয়োজিত নজরুল প্রণাম, অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান।

২৬ মে : রবীন্দ্রসদনে নজরুলগীতি ও আবৃত্তির আসর – সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান কালচারাল ট্রুপ-এর নিবেদন মুসাফির

২৭ মে : রবীন্দ্রসদনে নজরুলগীতি ও আবৃত্তির আসর, আকাডেমিতে চার্বাক-এর নাটক, শিশির মঞ্চে রঙ্গন গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাঙ্গনে মাস্কারেড-এর নাটক।

২৮ মে : রবীন্দ্রসদনে নজরুলগীতি ও আবৃত্তির আসর, আকাডেমিতে চেতনা গোষ্ঠীর নাটক, মুক্তাঙ্গনে ত্রিকোণ-এর নাটক।

২৯ মে : রবীন্দ্রসদনে নজরুলগীতি ও আবৃত্তির আসর, আকাডেমিতে থিয়েটার কমিউন-এর নাটক।

৩০ মে : আকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান মুক্তাঙ্গনে রঙরূপ গোষ্ঠীর নাটক।

৩১ মে : আকাডেমিতে শূদ্রক গোষ্ঠীর নাটক, শিশির মঞ্চে প্রতিকৃতি গোষ্ঠীর নাটক। মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার ফাইন-এর নাটক।

বেতার

১৬ মে : হৈমন্তী শুক্লার আধুনিক গান রাত ১০-৪০, সুবিনয় রায়ের রবীন্দ্র সংগীত রাত ১০-৫০।

১৭ মে : এ কাননের খেয়াল সকাল ৮-৩০, রাত ৮টায় বাংলা নাটক

১৮ মে : চিত্রলেখা চৌধুরীর রবীন্দ্র সংগীত সকাল ৭-৪০, ইন্দ্রাণী সেনের আধুনিক গান সকাল ৮-১৫।

১৯ মে : দুপুর ২-৪৫-এ বাংলা নাটক – ঝড়ের রাতে, রচনা – অসিত চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা – সমরেশ ঘোষ, উৎপলা সেনের আধুনিক গান রাত ১০-৫০।

২০ মে : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০।

২১ মে : প্রভাতভূষণের রবীন্দ্রসংগীত রাত ১০-২০।

২২ মে : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের খেয়াল সকাল ৮-৩০, রাত ৮টায় পুরনো দিনের শিল্পীদের কণ্ঠে নজরুলগীতির বিশেষ অনুষ্ঠান।

২৩ মে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান রাত ১০-৫০।

২৪ মে : রাত ৮টায় বাংলা নাটক প্রথম পানিপথ।

২৫ মে : অর্ঘ্য সেনের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, ধীরেন বসুর নজরুলগীতি সকাল ৮-২৫, বিকেল ৩টায় বাংলা নাটক।

২৬ মে : দুপুর ২-৪৫-এ বাংলা নাটক মৎস্যপুত্র, মূল কাহিনী আলেকজান্ডার বেলিয়েভ, বাংলা রূপান্তর।

২৭ মে : কালিদাস সান্যালের খেয়াল সকাল ৮-৩০, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান রাত ১০-৫০।

২৮ মে : রাত ৯-৩০-এ পুরনো দিনের শিল্পীদের কণ্ঠে নজরুলের নানা রসের গানের বিশেষ অনুষ্ঠান।

২৯ মে : রাত ৮টায় বিচিত্রা ক্লাব শব্দ দলিল চিত্র, প্রযোজনা – কল্পিতা সিংহ।

৩০ মে : রাত ১০-১৫তে বাংলা নাটক – সম্রাট অশোক, রচনা – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বেতার রূপ – মধু গুপ্ত।

৩১ মে : কৃষ্ণা ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৮টায় বাংলা নাটক – বুদ্‌বুদ্‌, রচনা – কিরণ মৈত্র, প্রযোজনা অজিত মুখোপাধ্যায়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনা লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN

SUKANYA 16 MAY 1985 Regn. No. 42166/84/RNI Postal Regn. No. WB/CC-423 Rs. 3.50

নতুন ল্যাকমে কসমেটিক সাবান



ত্বকের স্বপ্নময় লাবণ্যের জন্য.

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান বিশেষ ত্বক মোলায়েমের অয়েলে সমৃদ্ধ.

অনুভব করুন অঙ্গ ঘিরে ল্যাকমে কসমেটিকের ক্রীমেভরা ফেনা, নিজেই বুঝবেন সুরভিত এই ফেনার জাতই আলাদা।

এইতো ত্বককে মোলায়েম করা বিশেষ তেলের আদরভরা পরশ, যা আপনার ত্বককে করে তোলে পেলব কোমল, লাবণ্যে ঢলঢল।

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান।

প্রতি রমণীর কমনীয় ত্বকের স্বপ্ন আজ সার্থক।



Lakmé